উপায়নী

নরেন্দ্রনাথ মিত্র



অমৃত সাহিত্য মন্দির

১৬/১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম মুদ্রণ : মাঘ—১৩৬৬

—আড়াই টাকা—

প্রচ্ছদপট :

অঙ্কন—শ্রীদীপেন বসু

মুদ্রণ—রয়েল হাফটোন কোং

শ্রীঅবনীরঞ্জন মান্না কর্তৃক নিউ মহামায়া প্রেস, ৬৫।৭, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২
হইতে মুদ্রিত ও প্রতিমা চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।

শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

দেবযানী

'ওলো, ও দেবযানী, তোর কচ এসেছে। সেই "বিদায়-অভিশাপ"-এর কচ! স্বর্গপুরী থেকে আবার নেমে এসেছে এখানে।'

জানালার ধারে বসে শিপ্রা থার্ডক্লাসের মেয়েদের সাপ্তাহিক পরীক্ষার খাতা দেখছিল—রাস্তার ওধারের চাটুয্যে-বাড়ির গীতা-বউদি হাসতে হাসতে এসে তাকে একেবারে জড়িয়ে ধরল। বয়স তিরিশ ছাড়িয়েছে গীতার। কিন্তু চাপল্যে তারল্যে যেন অষ্টাদশী। ছেলেমেয়ে কিছু হয়নি। সংসারের ঝামেলা-ঝক্কি কম। শুধু স্বামী-স্ত্রী। স্বামী সারাদিন দোকানে পড়ে থাকে। আর ফেরে সেই রাত এগারোটায়। রেডিও শুনে, রেকর্ড বাজিয়ে বাজিয়ে গীতা যখন হয়রান হয়ে যায়, তখন বেরিয়ে পড়ে পাড়া-পড়শীর খোঁজখবর নিতে। অবিবাহিতা কমবয়সী মেয়েদের সঙ্গেই ওর বেশি বন্ধুত্ব।

শিপ্রা একটু বিরক্ত হয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে নিতে বলল, 'কী কাণ্ড তোমার বউদি! দিলে তো আমার পেনসিলের শিসটা ভেঙে? আরতি কবে এসেছে?'

গীতা বলল, 'কাল। আমি তো ভেবেছিলাম তুই সব জানিস। তোরই তো আগে জানবার কথা। অত বন্ধুত্ব তোর সঙ্গে!'

লাল পেনসিল দিয়ে পরীক্ষার খাতার বানান-ভুল কাটতে-কাটতে শিপ্রা বলল, 'হুঁ।'

গীতা বলল, 'কেন, তোদের চিঠিপত্র চলে না? আসবার আগে তোকে চিঠি দেয়নি?'

গীতা-বউদি যখন এসেছে, খাতা দেখা আর হবেনা। যতক্ষণ থাকবে অনর্গল কথা বলবে। তার কথা না শুনলে শিপ্রাকে আঙুল দিয়ে খোঁচাবে, চুল ধরে টানবে আর না-হয় চিমটি কাটবে।

শিপ্রার থার্ডক্লাসের ছাত্রীদের মধ্যেও এমন চপল স্বভাবের মেয়ে কম আছে।

খাতাগুলি সরিয়ে রেখে শিপ্রা বলল, 'চিঠিপত্র চলবেনা কেন, চলে। তবে বেশি তো আর লিখতে পারেনা। ও এখন গিন্নীবান্নী হয়েছে। আর আমারই বা সময় কই। স্কুলে পড়াই, টিউশনি করি।'

গীতা বলল, 'তা তো ঠিকই। তোরা ভাই কাজের মানুষ। আর আমরা অকম্মার ধাড়ি! যাই এবার। তুই কাজ কর্। আমি মল্লিকার কাছ থেকে একবার ঘুরে আসি। তারও নাকি বিয়ের কথাবার্তা প্রায় পাকা। শুনে আসি কী ব্যাপার।'

'আরে, বোসো বোসো।' শিপ্রা গীতার হাত চেপে ধরল। হাতে সোনার চুড়ি চারগাছা ক'রে, শাঁখা, তারপর আবার সখ ক'রে নীলরঙের কাঁচের চুড়িও পরেছে। বড়রাস্তার মোড়ের ভ্যারাইটি-স্টোর্সের মালিক ওর স্বামী। সে-দোকান প্রথমে ছোটই ছিল। দু'তিন বছরের মধ্যে ফুলে ফেঁপে উঠেছে। গীতা বলে, ওরই ভাগ্য। স্ত্রী-ভাগ্য ছাড়া কি পুরুষের ধন-দৌলত বাড়ে?

শিপ্রা বলল, 'বোসো বউদি, বোসো। চা খাও। আরতি কি একাই এসেছে নাকি?'

গীতা ওর মুখের কাছে নিজের মুখখানা এগিয়ে এনে হেসে বলল, 'ওলো না, জোড়ে এসেছে। এখন আর একা আসবে কোন্ দুঃখে। ওর বর তা আসতে দেবেই বা কেন। অমন সুন্দরী বউকে যার-তার সঙ্গে ছেড়ে দেবে, ভয় নেই প্রাণে?'

শিপ্রা একটু হাসল, 'তা ঠিক। সুজিতদা'রা ক'দিন থাকবে?'

গীতা বলল, 'তা জানিনে, ভাই। তোমার বন্ধু, তোমার বন্ধুর বর। আর সব খবর যোগাব বুঝি আমি? সপ্তাহখানেক তো থাকবেই। আরতির মা কি জামাইকে দু'একদিনেই ছেড়ে দেবেন? অতদূর থেকে এসেছে। আর মেয়েকে বোধহয় এখন নিজের কাছেই রাখবেন। ভাব-টাব দেখে মনে হল...' মুখ টিপে হাসল গীতা।

শিপ্রা কিন্তু হাসল না। গম্ভীর মুখে বলল, 'বলো কি, এরই মধ্যে!

গীতা বলল, 'এরই মধ্যে আবার কি। গত মাঘে একবছর ঘুরে গেছে না? ইচ্ছা করলে এরই মধ্যে ছেলে কোলে নিয়েও আসতে পারত। যাদের হয়, তাদের বিয়ের একবছরের মধ্যেই হতে পারে। যাদের হবার নয় তাদের দশবছরেও—'

শেষের দিকে গলাটা একটু ধরে এল গীতার।

কিন্তু সেদিকে শিপ্রার কান গেল না। সে পরম ক্ষোভের সঙ্গে বলতে লাগল, 'আরতি আমাকে আজকাল কোনো কথাই জানায় না। ওর কোনো সুখের খবরই দেয়না। ভাবে—' হঠাৎ শিপ্রা তক্তপোশ ছেড়ে উঠে পড়ল, 'যাই বউদি তোমার জন্যে চা করে নিয়ে আসি। তুমিও এসোনা, মা আছেন ভিতরে। চলো, তাঁর সঙ্গে দেখা করে যাবে।'

গীতা বলল, 'না ভাই। সন্ধ্যা হয়ে এল। এখন থাক। আর একদিন এসে মাসীমার সঙ্গে দেখা করব। সেদিন চা খেয়ে যাব তোমার হাতের। আমি তো প্রায়ই আসি। তুমিই যাওনা।'

শিপ্রা বুঝতে পারল গীতা-বউদি এখন মল্লিকাদের ওখানে যাবে। কার বিয়ে হবে, কোন্ ছেলের সঙ্গে কোন্ মেয়ের ভাব হল, কার ছেলেপুলে হবে এইসব খবর জেনে আর সবাইকে জানিয়ে গীতা-বউদির আনন্দ।

কিন্তু আরতি তাকে খবরটা দিলনা। আশ্চর্য।

সদর দরজা বন্ধ করে শিপ্রা ভিতরে চলে গেল। তার মা সুরমা রাত্রের রান্নাবান্নার আয়োজনে ব্যস্ত। ছোট দুটি ভাইবোন বাসু আর মঞ্জু কুকুরের বাচ্চাগুলি নিয়ে ছুটোছুটি করছে। শিপ্রা তাদের ধমকে উঠল, 'সন্ধ্যা হয়ে গেল চোখে দেখিসনা তোরা? হাতমুখ ধুয়ে পড়তে বসবি, না কানমলা খাবি?'

ওরা একটু অবাক হয়ে দিদির দিকে তাকিয়ে রইল। দিদি তো সহজে এত চটেনা। হল কি ওর! খেলা রেখে তারা ইঁদারার কাছে হাতমুখ ধোয়ার জন্যে চলে গেল।

রান্নাঘরের সামনে এসে দাঁড়াল শিপ্রা। সুরমা রুটি বেলছেন। উনুনে আঁচ দেওয়া হয়েছে। বাতাসে ধোঁয়া আসছে এদিকে। শিপ্রা বলল, 'জানো মা, আরতি এসেছে।'

সুরমা হেসে বললেন, 'ওমা, তাই নাকি। বাইরের ঘরে বসিয়ে রেখেছিস কেন। ভিতরে নিয়ে আয়।'

শিপ্রা বলল, 'আমাদের বাড়িতে আসেনি। বাপের বাড়ি এসেছে। সে এখন বড়লোক—আমাদের এখানে কি আর আসবে? আর তার নাকি—তার নাকি...'

'তার নাকি কি শিপ্রা?'

'তার নাকি ছেলেপুলে হবে।' শিপ্রা নিজেই লজ্জা পেয়ে হেসে মুখ ফিরিয়ে নিল। বিয়ের পর এত তাড়াতাড়ি আরতির অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার লজ্জাটা যেন তারই।

সুরমা হেসে বললেন, 'ওমা, তাই নাকি! বেশ বেশ।' তারপর কি-একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় গম্ভীরভাবে রুটি-বেলায় মন দিলেন। আরতি আর তাঁর শিপ্রা একই সঙ্গে তো বি, এ, পাস করেছে। ওরা একই বয়সী। শিপ্রাকে বিয়ে দিলেও এতদিন কোন্‌না—। সম্বন্ধ তো দু' একটা আসে। কিন্তু মেয়ের পছন্দই হয়না। স্কুল, সভা-সমিতি আর মেয়েদের ক্লাব নিয়েই আছে।

শিপ্রা ভাইবোনদের পড়তে বসিয়ে নিজে বাইরের ঘরে এসে ফের খাতা দেখতে বসল।

উঠোনে আমগাছ দুটোয় দারুণ বোল ধরেছে। দক্ষিণের হাওয়ায় জানলা দিয়ে তার গন্ধ ভেসে আসছে। উঠোন পেরিয়ে সামনের বড় চওড়া রাস্তাটাও এখান থেকে বেশ চোখে পড়ে। লাইট-পোস্টের বাল্‌ব্‌গুলি জ্বলে উঠেছে এতক্ষণে। রাস্তা পেরিয়ে বড় একটা উঁচু পাঁচিল। পাঁচিলের ওপারে রাজাবাবুদের বাগান। দারোয়ানকে মিষ্টিকথায় বশ ক'রে শিপ্রা আর আরতি কত যে ওই বাগানে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছে তার ঠিক নেই। ফুল তুলেছে, প্রকাণ্ড দীঘিটার ধারে ঘাসের ওপর বসে বসে গল্প করেছে।

ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব কি শিপ্রার আজ ! সেই ফার্স্ট্-ইয়ার থেকে। তারপর বছরে বছরে সেই বন্ধুত্ব গাঢ় হয়েছে, প্রগাঢ় হয়েছে। তাদের সখিত্ব দেখে সংস্কৃতের প্রফেসর শিওপ্রসাদ শর্মা বলতেন—অনসূয়া-প্রিয়ংবদা। আরতি হেসে বলত—'শর্মাজীর চোখ নেই। আমরা ডবল শকুন্তলা।'

শিপ্রা হেসে জবাব দিত—'সে-গর্ব তুই করতে পারিস, আরতি। চেহারার দিক থেকে আমি তোর সখী তো ভালো, দাসী-বাঁদী হওয়ারও যোগ্য নই।'

এ-কথা শুনে আরতি ওর গাল টেনে ধরে বলেছিল, 'ফের যদি অমন কথা বলবি, তোর সঙ্গে আমার জন্মের মতো ঝগড়া হয়ে যাবে। চেহারা ! পেয়েছিস এক চেহারা। চেহারাই বুঝি সব ! তোর মতো বুদ্ধি ক'জনের আছে শুনি ! তোর মতো ডিবেট করতে, বক্তৃতা দিতে, আবৃত্তি করতে কলেজের মেয়েরা তো ভালো, ছেলেদের মধ্যেই বা ক'জনে পারে শুনি ? তোর যা গুণ তার এক রতি পেলে আমি বর্তে যেতাম।'

ধীরে ধীরে তার রূপের দৈন্যটা ভুলে যায় শিপ্রা। কলেজে পাশাপাশি বসে। দিন ভরে অত কথা হওয়া সত্ত্বেও প্রফেসরদের লেকচারের সময় দুই সখীতে খাতায় চিঠি লেখালেখি করে। শিপ্রা এক লাইন লেখে, আরতি আর এক লাইন। কখনো বা শুধু একটি করে শব্দ। কখনো বা তাও নয়, শুধু একটি করে আঁচড়। কথা কিছু বলবার নেই, নতুন কিছু জানাবারও নেই। তবু মন-জানাজানি শেষ হয়না।

ওরা একসঙ্গে যায়। একসঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। একসঙ্গে পড়ে। শিপ্রাদের বাড়িতে আরতি-ই বেশি পড়তে আসে। যদিও আরতির বাবা শহরের নামকরা ডাক্তার। নিজের বাড়ি আছে—আত্মীয়-স্বজন, চাকর-দারোয়ানে বাড়ি ভরতি। শিপ্রার বাবা ব্যাঙ্কের কেরানী। ভাড়াটে বাড়িতে বাস। তবু আরতি ছুটির দিনে কি কলেজ ছুটি হয়ে যাওয়ার পর নিজেই শিপ্রাদের বাড়িতে চলে আসে। শিপ্রার মাকে বলে—'মাসীমা, এই বাড়িই আমার ভালো

লাগে। বেশ নিরিবিলি জায়গা। চুপচাপ বসে বসে ভাবা যায়, পড়াশুনো করা যায়। আমাদের বাড়ি তো নয়, একটা হাট !'

আরতির মনের ভাব বুঝতে শিপ্রার বাকি থাকতনা। পাছে ওদের বাড়িতে যেতে শিপ্রার কোন সংকোচ হয়, পাছে আরতির গরীব বন্ধুকে কেউ কোনরকম অবজ্ঞার চোখে দেখে তাই আরতিই আসত, শিপ্রাকে সে বেশি যেতে বলতনা। সেদিক থেকে খুব বিবেচনা ছিল আরতির। ছেলেরা কেউ কেউ তার সঙ্গে আলাপ করতে চাইত, সামান্য আলাপের পর ঘনিষ্ঠতার জন্যে উদ্‌গ্রীব হত, কিন্তু আরতি ওদের বেশি আমল দিতনা ; বলত—'দূর, আমার ওসব পছন্দ হয়না। ছেলেরা বড় হ্যাংলা।'

শিপ্রা হেসে বলত—'হ্যাংলা বলছিস কি রে ? পদ্মের কাছেই তো ভোমরারা এসে গুনগুন করে।'

আরতি বলত—'ধুত্তোর তোর গুনগুনানি ! কানের যে দফা রফা।'

ফোর্থ-ইয়ারে উঠল শিপ্রা আর আরতি। কলেজের ফাউণ্ডেশন-ডে খুব জমকালো করে উদ্‌যাপন করা হবে। এই নিয়ে খুব জল্পনা কল্পনা চলতে লাগল। কলেজে সম্প্রতি কো-এডুকেশন চালু হয়েছে। ছেলেদের দলের মুখপাত্র হয়ে থার্ডইয়ার আর্টস-এর রণেন সান্যাল আর ফোর্থ-ইয়ার সায়ান্সের দিলীপ সেন এসে বলল, 'আমরা কি একসঙ্গে শুধু পড়ব ? কাজ করবনা ?'

ছেলেদের সঙ্গে কথা বলতে শিপ্রার পটুতাই বেশি। আরতি ভারি লাজুক। চন্দ্রা, মালা, তপতীও তাই। যে কয়েকটি বিহারী মেয়ে আছে, তারা তো আরো। তাই নেত্রীত্ব শিপ্রার ওপর স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ল। নানা কাজের জন্যে কমিটি সাব-কমিটি গঠন, ফাংশনের সভাপতি প্রধান-অতিথি নির্বাচন, প্রোগ্রাম ঠিক করা, ডেকরেশনের ব্যবস্থা করা কাজ কি একটা-দুটো ? রণেন আর দিলীপ হিমসিম খেয়ে গেল। কাজের ছেলে কম। ফাঁকিবাজের সংখ্যা বেশি। এতবড় দায়িত্ব নিয়ে শিপ্রারও দুর্ভাবনার অন্ত নেই। এখন দায় উদ্ধার করতে পারলে হয় !

এইসময় এল সুজিতদা। সুজিত দাশগুপ্ত। এই কলেজেরই এক্স-স্টুডেণ্ট। ছ'বছর আই. এস্‌সি. পড়েছিল। তারপর কলকাতায় চলে যায়। শিবপুর থেকে ইঞ্জিনীয়ারিং পাস ক'রে দুর্গাপুরে সরকারী চাকরিতে ঢুকেছে। তাঁর বাবা নিজেদের বাসা তুলে দিয়েছেন এখান থেকে। রিটায়ার করে যাদবপুরে ছোট একটি বাড়ি করেছেন। সব খবরই সুজিতদা'র মুখে শুনেছিল শিপ্রা। প্রথমে এক বন্ধুর বাড়িতে উঠে নেপথ্যে ছিল সুজিত। কিন্তু রণেন আর দিলীপ খোঁজ পেয়ে তাকে প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে টেনে আনল। ফাংশনের প্রধান ইঞ্জিনীয়ার হল সুজিত। শিপ্রা তার প্রধান সহকারিণী। সুজিত না জানে এমন কাজ নেই, না বলে এমন কথা নেই।

দু'দিন যেতে-না-যেতেই সুজিত শিপ্রাকে বলল, 'দেখুন, বার বার "আপনি" বলতে গেলে আমার জিভে আটকে যায়। এখন থেকে আমি আপনার সঙ্গে শুধু ইশারায় কথা বলব, তাতে আপনি-তুমির সমস্যা উঠবেনা।'

শিপ্রা হেসে বলল, 'আমাকে "আপনি" বলতে আপনাকে মাথার দিব্যি কে দিয়েছে? আপনি তো বয়সে বড়। আপনি আমাকে "তুমি"ই বলবেন।'

সুজিত বলল, 'হুঁ, একতরফা "তুমি" হলে, লোকে ভাববে আমাদের মধ্যে ঠাকুরদা-নাতনীর সম্পর্ক। সেটা আমার বাঞ্ছনীয় নয়।'

পরদিন থেকে সুজিত শিপ্রাকে শুধু "তুমি" বললই না, ওকে দিয়ে "তুমি" বলিয়েও নিল।

কাজ এগিয়ে চলল পুরোদমে। সভাপতি কলেজের প্রিন্সিপ্যালই হলেন। প্রধান-অতিথি হিসেবে যে বিখ্যাত সাহিত্যিকের আসবার কথা ছিল তিনি হঠাৎ টেলিগ্রাম করে জানালেন, আসতে পারবেন না, জরুরী কাজের জন্যে দিল্লীতে যেতে হচ্ছে। রণেন আর দিলীপ তো মাথায় হাত দিয়ে বসল। কিন্তু সুজিত বলল, 'কুছপরোয়া নেই। কলকাতায় লেখকের অভাব আছে নাকি? বড় না হোক, মেজো-সেজো একজনকে আনতেই পারব।'

যে কথা সেই কাজ। সেইদিনই দিলীপকে জনপাঁচেক লেখকের নামের তালিকা দিয়ে পাঠানো হল। সেইসঙ্গে নানা জনের কাছে সুপারিশ চিঠি। যাকে পাও ধরে নিয়ে এসো। মুখে অবশ্য বলবে 'বরণ করে নিয়ে যাচ্ছি।'

প্রধান-অতিথি ঠিক হয়ে গেল। কার্ড ছাপানো হল। শহরের গণ্যমান্যদের নিমন্ত্রণপত্র পাঠাবার বিধি-ব্যবস্থা হয়ে গেল।

আরতির বাবাকে নিজে গিয়ে কার্ড দিয়ে এল শিপ্রা। হেসে বলল, 'যাবেন কিন্তু মেসোমশাই।'

পড়ার ঘরে আরতি চুপ করে বসেছিল, শিপ্রা পিছনে থেকে গিয়ে তার চুল ধরে টান দিল, 'কি, এই বুঝি পড়া হচ্ছে!'

আরতি তার দিকে না তাকিয়ে বলল, 'থাক, আর অত আদরে কাজ নেই! আমার সঙ্গে তো তুই সম্পর্ক তুলেই দিয়েছিস। এখন সুজিতবাবু আর ফাংশনই তোর সব।'

শিপ্রা বন্ধুর থুতনি ধরে বলল, 'আহা, ফাংশন বুঝি আমার একার—তোদের নয়? চল্, সুজিতবাবুর সঙ্গে তোর আলাপ করিয়ে দিচ্ছি।'

আরতি কি সহজে আসতে চায়! শিপ্রা বন্ধুকে জোর করে টেনে নিয়ে গেল। কলেজে একতলায় পুব-দক্ষিণ কোণের ঘরটায় অনুষ্ঠানের অস্থায়ী অফিস বসেছে। সুজিত কর্মীদের উপদেশ-নির্দেশ দিচ্ছে। নামে সে কমিটির কিছু নয়। জেনারেল সেক্রেটারি রণেন সান্যাল। কিন্তু আসলে সুজিত-ই নাটের গুরু নিত্যানন্দ।

শিপ্রা আরতির সঙ্গে সুজিতের আলাপ করিয়ে দিয়ে বলল, 'আমার বন্ধু, সুজিতদা।'

এখন শিপ্রার মনে পড়ছে সুজিত সেই প্রথমদৃষ্টিতেই মুগ্ধ হয়েছিল। অপলকে তাকিয়ে ছিল আরতির মুখের দিকে। কিন্তু শিপ্রার তখন ওসব দিকে খেয়াল ছিলনা। কাজের প্রোগ্রাম নিয়ে সে তখন ব্যস্ত।

তারপর থেকে আরতিকে সে রোজ সঙ্গে করে নিয়ে আসতে লাগল। বহুদিনের বন্ধু আরতি। ফাংশনের কাজে সেই বন্ধুত্ব

যেন ক্ষুণ্ণ না হয়। দেখা গেল আরতিরও আসরে আসতে আর আপত্তি নেই। কাজকর্মে তার উৎসাহ বেড়ে গেছে। এখন যাকে বলে সে একেবারে সক্রিয় সহযোগিনী।

হিন্দুস্থানী ছাত্রীরা একটি একাঙ্কিকা নাটিকা করবে।

সুজিত বলল, 'তোমরাও একটা করো, নইলে ওদের কাছে হেরে যাবে। বাঙালীর প্রেস্টিজ থাকবে না।'

নিজেদের জন্য রবীন্দ্রনাথ থেকে গান আর আবৃত্তি ঠিক করে রেখেছিল শিপ্রা। সে বলল, 'এই ঈলেভেন্‌থ্‌-আওয়ারে নতুন আর কি হবে। পার্ট-ই বা মুখস্থ করবে কে।'

'সঞ্চয়িতা'খানা হাতে ছিল সুজিতের। সে পাতা উলটাতে উলটাতে বলল, 'আচ্ছা, তোমরা "বিদায়-অভিশাপ" তো করতে পার। না, শুধু আবৃত্তি নয়—অভিনয়। পিছনে দৃশ্যপট থাকবে। মাঝে মাঝে গান বসিয়ে দেবো। শিপ্রা, তোমার তো আবৃত্তিতে প্রতিভা আছে। এখন শুধু একজন কচ চাই।'

রণেন আর দিলীপ বলল, 'কচ আপনিই হোন, সুজিতদা।'

আশ্চর্য, শিপ্রার মনের কথাটা ওরা টের পেল কী করে!

সুজিত হেসে বলল, 'দূর, তাই কি হয়! আমি কচ হলে, তোমাদের তরুণ প্রফেসরদের বুকে সেটা খচ্‌খচ্‌ করে বিঁধবে। আর বৃদ্ধ দর্শকদের চোখ কর্‌কর্‌ বুক ধড়ফড় করবে। তার দরকার নেই। আমি পিছনে থেকে সব ঠিকঠাক করে দেবো। তোমাদের ছাত্রদের মধ্যে যে দেখতে সুদর্শন, যার কণ্ঠ সুললিত সেই হবে কচ।

তেমন ছেলে যে খুব দুর্লভ তা নয়। কিন্তু কর্তৃপক্ষ আপত্তি করলেন। সহশিক্ষা চললেও সহ-অভিনয় চলবে না। কলেজের স্টেডিয়ামে ছেলেমেয়ে একসঙ্গে অভিনয় করলে তা নিয়ে কথা উঠবে। মফঃস্বল শহর। সে ঝুঁকি কে নেবে। প্রিন্সিপ্যাল অন্তত নেবেননা।

সুজিত বলল, 'বেশ, তাহলে আরতি কচ হোক। চেহারা ভালো, লম্বাটম্বাও আছে। ওকে মানাবে ভালো।'

এ প্রস্তাবে শিপ্রাও খুব খুশি। তার এতদিনের বন্ধু হবে কচ—এর চেয়ে আনন্দের কথা আর কী আছে।

কিন্তু আরতি সহজে রাজী হতে চায়না। তার বুঝি পুরুষ সাজতে লজ্জা করেনা? তার কি পুরুষের মতো চেহারা? কেন, শিপ্রা কচ হোক।

শিপ্রা হেসে বলল, 'আমিই হতাম। কিন্তু তুই যে আমার চেয়ে মাথায় ঢের লম্বা। আমাকে কচ মানাবে কেন? অমত করিসনে, ভাই—সুজিতদার মান রাখতে হবে।'

তাই হল। রাত জেগে জেগে শিপ্রা দেবযানীর পার্ট মুখস্থ করে ফেলল। বহুবার পড়া কবিতা। বার-আনি প্রায় মুখস্থই ছিল। উৎসাহে আগ্রহে বাকিটুকু তৈরি করতে দেরি হোলনা।

ছুপুরের গাড়িতে প্রধান-অতিথি কলকাতা থেকে এসে পৌঁছলেন। তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্য দলের সঙ্গে শিপ্রাও গেল, কিন্তু শেষরাত থেকে সে আর 'শিপ্রা' নয়, সে শুধু 'দেবযানী'। কাজ করছে, কথা বলছে—আর সেইসঙ্গে মনে-মনে আবৃত্তিও চলেছে—

"কতদিন এই বনে
দিক্-দিগন্তরে আষাঢ়ের নীল জটা
শ্যামস্নিগ্ধ বরষার নবঘনঘটা
নেবেছিল, অবিরল বৃষ্টিজলধারে
কর্মহীন দিনে সঘন কল্পনাভারে
পীড়িত হৃদয় ;"

সেই আষাঢ়ের জলধারা সারাদিন ধরে মনের মধ্যে ঝ'রে পড়তে লাগল শিপ্রার। একই সঙ্গে মনোভূমিতে বর্ষা আর বসন্তের আবির্ভাব হল।

অন্য অনুষ্ঠানগুলি হয়ে গেল। সর্বশেষে 'বিদায়-অভিশাপ'।

সুজিতের গুণের শেষ নেই। সে মঞ্চ সাজিয়েছে ; দৃশ্যপট নির্বাচন করেছে। 'গীতবিতান' থেকে গান বেছে দিয়েছে, নায়ক-নায়িকাকে

সাজাবার ভারও তার ওপর। কোন্ রঙের শাড়ি পরতে হবে, কিভাবে চুল বাঁধতে হবে শিপ্রাকে বলে দিল সুজিত। আরতির চুলগুলি নিজে চূড়া করে বেঁধে দিল, গায়ে জড়িয়ে দিল শ্বেত-উত্তরীয়, আর শেষে করল কি—হ্যাণ্ডেলের গোড়া দোয়াতের মধ্যে ডুবিয়ে আরতির অমন তিলফুল বিজয়ী নাকের নিচে একটি কচি-কিশলয় গোঁফ এঁকে দিল।

আয়নায় নিজের চেহারা দেখে আরতি ফিক করে হেসে ফেলল, তারপর সুজিতের দিকে চেয়ে বলল, 'ছি ছি ছি, কী করলেন বলুন তো।

সুজিত বলল, 'বেশ করেছি। নইলে দেবযানী তোমার প্রেমে পড়বে কেন।'

তারপর অভিনয়। নিজের অংশটা প্রাণমন ঢেলে আবৃত্তি করল শিপ্রা। কচের সামনে এগিয়ে গিয়ে গভীর আশায় আশ্বাসে অনুরাগে যখন বলল,—

"সুখ নাই যশের গৌরবে।
হেথা বেণুমতীতীরে মোরা দুই জন
অভিনব স্বর্গলোক করিব সৃজন
এ নির্জন বনচ্ছায়া-সাথে মিশাইয়া
নিভৃত বিশ্রব্ধ মুগ্ধ দুইখানি হিয়া
নিখিলবিস্মৃত।"

—তখন দর্শকদের সমস্ত হৃদয় সেই-দুটি হৃদয়ের সঙ্গে মিশে রইল।

কিন্তু দেবযানীর প্রত্যাশা পূরণ হবার নয়। কচকে বিদায় নিতেই হল। সঞ্জীবনী-বিদ্যা তাকে স্বর্গে বহন করে নিয়ে যেতে হবে। দেবতাদের নতুন দেবত্ব দিলে তবেই তার অস্তিত্ব সার্থক।

তারপর অভিশাপ আর বর বিনিময় এবং স্তব্ধ নীল যবনিকা পতন।

মুগ্ধ সভা এবার গুঞ্জন করে উঠল। শিপ্রার অভিনয় অপূর্ব হয়েছে। কচ কোনরকমে কাজ চালিয়ে গেছে মাত্র। তাও দু'বার পার্ট ভুলে গিয়েছিল। প্রম্পটিং বুঝতে না পেরে ছন্দপতন ঘটিয়েছে। এক্সপ্রেসন তো দিতেই পারেনি।

দেবযানী তিনটি মেডেল পেল। তার মধ্যে একটি সোনার। ডোনার শহরের ধনী মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী। প্রিন্সিপ্যাল কচকেও একটি রৌপ্যপদকের প্রতিশ্রুতি দিলেন। তা শুনে আরতি নিজেই ম্লান হেসে বলল—'কনসোলেশন প্রাইজ।'

. শিপ্রা বন্ধুকে কাছে টেনে নিয়ে বলল, 'তাতে কী হয়েছে। সামনের বছর তোকে একটা খুব ভালো পার্ট দেবো। আগে থেকে রিহার্সাল দিয়ে রাখব।' তারপর কচের শেষ কথাটির পুনরাবৃত্তি করে বলল, 'তুমি সুখী হবে, ভুলে যাবে সর্বগ্লানি বিপুল গৌরবে।'

তখন কি শিপ্রা জানত ছ'মাস যেতে-না-যেতেই তার কথা এমন করে ফলে যাবে।

আরতির দিদিরা সমালোচনা করতে লাগলেন—'কচের পার্টে আছে কী যে—ও করবে। রবীন্দ্রনাথও তো পুরুষ কবি। সমস্ত দরদ দেবযানীর ওপর ঢেলে দিয়েছেন। যত ভালো-ভালো কথা বসিয়ে দিয়েছেন তার মুখে। কচকে কী দিয়েছেন? শেষ দুটি লাইনে হঠাৎ তাকে খুব বড় করেছেন, কিন্তু তাতে তার পার্ট তো আর বড় হয়নি।'

ফাংশনের পর আরও একসপ্তাহ সুজিত এই শহরে রইল। তার মধ্যে দু'দিন আরতিদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেল। একদিন ওদের নিয়ে সিনেমা দেখল আর একদিন টাঙ্গা করে ঘুরে বেড়াল শহর। আশ্চর্য, শিপ্রাকে কেউ ওরা ডাকলনা। হয়তো আরতির দিদিদেরই চক্রান্ত। হয়তো তাঁরা ভেবেছেন, যে-মেয়ে সোনার মেডেল পেয়েছে তার আর কিছুতে দরকার কি।

যাওয়ার সময় সুজিত অবশ্য দেখা করে গেল। কিন্তু সে দেখা কি দেখা! কোনো কথাই হলনা। ঘরে আরো লোকজন ছিল। নিরালায় দেখা করতে সুজিতের কোনো গরজ ছিলনা। 'দশ শত বর্ষ পরে এইকি বিদায়!'

আরো কিছুদিন পরে, কিন্তু বি. এ. পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোবার আগেই খবরটা বেরিয়ে পড়ল। পাড়ার গেজেট গীতা-বউদি এসে বললেন, 'ও দেবযানী, তোর বন্ধুর যে বিয়ে।'

সেই অভিনয়ের পর থেকে তাদের তুজনকে একসঙ্গে দেখলে সবাই পিছন থেকে বলত কচ-দেবযানী যাচ্ছে।

শিপ্রা জিজ্ঞাসা করলনা, কার সঙ্গে। এমন যে হবে সে মনে-মনে আগেই টের পেয়েছিল।

শিপ্রার মা শুনে বললেন, 'ওরা জাতে এক। পাল্‌টি ঘর। সব মিলে গেছে। শুনেছি, কোষ্ঠীতে পর্যন্ত লিখেছে রাজযোটক।'

ওদের সব মিলে গেছে। শুধু শিপ্রার সঙ্গেই কোনো মিল নেই। গায়ের রঙে, জাতিতে, আর্থিক অবস্থায়—সবদিক থেকে সে অসবর্ণা।

একখানা খাতা দেখাও যে হয়নি হঠাৎ খেয়াল হল শিপ্রার। ছি ছি ছি, কাল সকালেই যে এগুলি স্কুলে নিয়ে যেতে হবে। এতক্ষণ করছিল কি সে! খাতাগুলি ফের কোলের কাছে টেনে নিল শিপ্রা। রঙীন পেনসিল দিয়ে মার্জিনে নম্বর বসাতে লাগল।

পুরো খাতাটা তখনো দেখা হয়নি। সদর দরজার কড়া নড়ে উঠল। খিল খুলে দিয়ে শিপ্রা অবাক হয়ে বলল, 'আরতি, তুই!'

আরতি হেসে বলল, 'তোকে একটা সারপ্রাইজ দেবো ব'লে আগে খবর দিইনি।'

শিপ্রা বলল, 'বেশ করেছিস।'

আরতির স্বামীও আছে পিছনে দাঁড়িয়ে, দশভুজার চালচিত্রে মহাদেব যেমন একটু নেপথ্যে থাকেন তেমনি।

শিপ্রা বলল, 'আসুন, সুজিতবাবু।'

সুজিত বলল, 'আমি আবার বাবু হলাম কবে?'

শিপ্রা বলল, 'সেই ফাংশন শেষ হবার পর।'

সুজিত একটু গম্ভীর হয়ে গেল। কিন্তু কোনো জবাব দিলনা।

তুজনকে চেয়ার এগিয়ে দিল শিপ্রা। মাকে ভিতরে খবর দিল। ভাইকে ডেকে ফিসফিস করে কি যেন ব'লে পাঠিয়ে দিল খাবারের দোকানে।

সুরমা এসে দাঁড়ালে সুজিত আর আরতি তাঁকে প্রণাম করল।

আরতি হেসে বলল, 'ভালো আছেন, মাসীমা? মেসোমশাই কোথায়। তাঁকে যে দেখছিনে।'

সুরমা বললেন, 'তাঁর ফিরতে একটু রাত হয়, মা।'

আরতি শিপ্রার দিকে চেয়ে বলল, 'ও, তাঁর সেই পার্ট-টাইমটা বুঝি এখনো—' কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কথাটা পালটে নিয়ে বলল, 'তারপর তোর স্কুল কেমন চলছে বল্।'

সুরমা ভিতরে যেতে যেতে বললেন, 'তোমরা বসে গল্প করো আরতি, আমি আসছি।'

তিনি চলে যেতে শিপ্রা বন্ধুকে একান্তে ডেকে কানের কাছে মুখ নিয়ে একটা কথা ফিসফিস ক'রে জিজ্ঞাসা করল।

আরতি তাড়া দিয়ে উঠল, 'যাঃ!' তারপর হেসে বলল, 'আমি কি অতই কাঁচা যে, এত তাড়াতাড়ি জড়িয়ে পড়ব?'

দুই সখীর মধ্যে আলোচনার বিষয়টা আন্দাজ করতে পেরে সুজিতও হো-হো করে হেসে উঠল।

তারপর এ-কথা সে-কথা নিয়ে গল্প। সেই ফাংশনের প্রসঙ্গও তুলল সুজিত। শিপ্রার মতো আবৃত্তি নাকি কলকাতার কোনো মেয়ের মুখেও শোনেনি সে।

হঠাৎ শিপ্রা বলল, 'আচ্ছা সুজিতবাবু, একটা বাজি রাখতে রাজী আছেন?'

সুজিত একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে বলল, 'ফের বাবু?'

শিপ্রা বলল, 'ওটা বিলুপ্ত হবে, যদি বাজিতে জিততে পারেন।'

'বেশ, বাজিটা কী।'

শিপ্রা বলল, 'আপনি আপনার স্ত্রীকে ফের সেইরকম কচ সাজাতে পারেন?'

সুজিত বলল, 'নিশ্চয়ই। কখন?'

শিপ্রা বলল, 'এখন, এইমুহূর্তে।'

সুজিত প্রথমে বলল, 'তা কি করে হবে।' তারপর একটু ভেবে ঘরের চারদিকে একটু চোখ বুলিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, পারি।

আমার মতো গ্রেট ম্যাজিসিয়ানের অসাধ্য কোনো কাজ নেই।'

শিপ্রা বলল, 'বেশ, রাখুন বাজি। যে হারবে তাকে দশটাকা দিতে হবে।'

'মাত্র দশ?'

'বেশ, পঁচিশ।'

সুজিত বলল, 'আচ্ছা, রাজী। কিন্তু ঘরের দুটো দরজা বন্ধ করে দিন। কেউ এসে পড়লে তিনি লজ্জা পাবেন।'

শিপ্রা উঠে গিয়ে রাস্তার দিকের এবং ভিতরের দিকের দুটি দোরই বন্ধ করে দিয়ে এল।

সুজিত তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বিছানার গেরুয়া-রঙের চাদরটা তুলে নিল। তারপর আরতির গায়ে সেটা ভালো করে জড়িয়ে দিতে লাগল।

আরতি বলল, 'ছাড়ো ছাড়ো, তুমি কি পাগল হলে? আমি দিচ্ছি তোমাকে পঁচিশ টাকা।'

সুজিত গম্ভীরভাবে বলল, 'আমার প্রেস্টিজের দাম পঁচিশ টাকার চেয়ে বেশি।'

এতেই ক্ষান্ত হলনা সুজিত। শিপ্রার খাতা-দেখা দু'দিকে কাটা যে লাল-নীল-রঙের পেনসিলটা পড়ে ছিল, সেটা তুলে নিয়ে আরতির ঠোঁটে নীলরঙের গোঁফ এঁকে দিল।

আরতি তার হাত ছাড়াতে না পেরে অসহায়ভাবে বলল, 'দেখ দেখ, কাণ্ড দেখ!'

সুজিত শিপ্রার দিকে চেয়ে হেসে বলল, 'কেমন, জিত? এবার অভিনয়টা হোক।'

শিপ্রা বলল, 'হবে। আগে রিহার্সালটা দিয়ে নিই। ততক্ষণ আপনি একটু বাইরে গিয়ে দাঁড়ান। প্লীজ!'

দোর খুলে সুজিতকে বাইরে পাঠিয়ে দিল শিপ্রা।

তারপর দেবযানী ফের কচের সামনে এসে দাঁড়াল। তার দুই কাঁধে রাখল দুই হাত, তারপর গভীর আবেগের সঙ্গে বলতে লাগল,

“এসেছিল কতদিন
অকস্মাৎ বসন্তের বাধাবন্ধহীন
উল্লাসহিল্লোলাকুল যৌবন-উৎসাহ,
সংগীতমুখর সেই আবেগপ্রবাহ
লতায় পাতায় পুষ্পে বনে বনান্তরে
ব্যাপ্ত করি দিয়াছিল লহরে লহরে
আনন্দপ্লাবন।”

আরতি তাকে বাধা দিয়ে হেসে বলল, ‘তোর এতও মনে থাকে! আমি কিন্তু কিছুই বলতে পারব না। আমি সব ভুলে গেছি।’

দেবযানী বলল, ‘তুমি ভুলে গেছ কচ। কিন্তু আমি ভুলিনি।’

তারপর আরো দু’পা এগিয়ে এসে ছলছল চোখে আবেগরুদ্ধ স্বরে বলতে লাগল,

“যেমনি তুলেছ মুখ, চেয়েছ যেমনি,
যেমনি শুনেছ তুমি মোর কণ্ঠধ্বনি,
অমনি সর্বাঙ্গে তব কম্পিয়াছে হিয়া—
নড়িলে হীরক যথা পড়ে ঠিকরিয়া
আলোক তাহার। সেকি আমি দেখি নাই?
ধরা পড়িয়াছ বন্ধু, বন্দী তুমি তাই
মোর কাছে।”

বলতে বলতে দেবযানী কচকে জড়িয়ে ধরে গভীর আবেগে তার দুই ঠোঁট চুম্বন করল।

আরতি একমুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে থেকে খিলখিল করে হেসে উঠে বলল, ‘ছাড় শিপ্রা, ছাড়! তুই কি পাগল হলি?’

একটি বিনিদ্র রজনী

মাসখানেক ধরে বাণ্ডিলটা আমার কাছে পড়ে ছিল। রেলকর্মী রিক্রিয়েশন ক্লাবের সম্পাদক মাঝে মাঝে ফোন করেন, মাঝে মাঝে পোষ্টকার্ডে পত্রাঘাত : 'লেখাগুলি কি দেখছেন? ফাংশনের দিন ঠিক হয়ে গেছে। এবার কম্পিটিশনের রেজাল্টটা জানতে না পারলে আমাদের বড় অসুবিধেয় পড়তে হবে।'

অসুবিধা আমারও কম নয়। ছোট বড় খান পঁচিশেক খাতা ভদ্রলোক আমাকে গছিয়ে দিয়ে গেছেন। পঁচিশজনের এই সাহিত্য প্রয়াসের ভিতর থেকে তিনটি রচনা আমাকে বেছে বের করতে হবে। স্থির করতে হবে কে প্রথম কে দ্বিতীয়, কারই বা তৃতীয় স্থান।

শুরুতেই আমি সেক্রেটারীকে হাত জোড় করে বলেছিলাম, 'আমাকে রেহাই দিন। বাছাই করবার ক্ষমতা যদি থাকবে তাহলে কাগজের সম্পাদক হতাম; দুরু দুরু বুক নিয়ে পাঠক আর সমালোচকদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতাম না।'

কিন্তু সেক্রেটারী রেহাই দেননি। বলেছেন, 'দিন না একটু কষ্ট করে দেখে। সবাই খুশি হবে।' তারপর গলা নামিয়ে বলেছেন, 'সব লেখা আপনার আগাগোড়া না পড়লেও চলবে। প্রথম দুটি একটি পাতা, এমন কি দু একটা প্যারাগ্রাফ পড়লেই তো বুঝতে পারবেন—।'

'রাঁধুনীরা যেমন দু একটা ভাত টিপে এক হাঁড়ি ভাতের কথা বলে দেয়। কিন্তু আমি তো তেমন রাঁধুনী নই।' অনুনয় বিনয়ে কোন কাজই হয়নি। মোটা সুতো দিয়ে বাঁধা একরাশ খাতা ভদ্রলোক আমার টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে বিদায় নিয়েছেন।

তারপর ফোন আর চিঠি। শেষ পর্যন্ত বাইশ তেইশ বছরের এক

যুবক এসে বলল, 'কাল আমাদের ফাংশন। লেখাগুলি নিতে এসেছি।'

আমি একটু মাথা চুলকে বললাম, 'তাই তো কাজকর্মের এত চাপ—। আমি যে কিছুই করে উঠতে পারিনি।' ভেবেছিলাম রাগ করে ছেলেটি খাতাগুলি নিয়ে যাবে। কিন্তু তা করল না। বললে, 'বেশ তাহলে আজ দেখে রাখুন। কাল সকালে এসে নিয়ে যাব।'

আমি অসহায়ের মত বললাম, 'এত তাড়াতাড়ি কি করে হবে।' ছেলেটি একটু চিন্তা করে বলল, 'আচ্ছা সকালে না হোক ফাংশনের ঘণ্টা দুই আগে পেলেই আমাদের চলবে। না হয় আর একটু সময় আপনি নেবেন। আপনি না যাওয়া পর্যন্ত তো সভা আরম্ভ হবে না।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'সে কি আমি আবার কোথায় যাব।'

ছেলেটি চোখ বড় করে বলল, 'কেন আমাদের ক্লাবে। না না, তা হয় না এখন আর আপনি না করতে পারেন না। আমরা অ্যানাউন্স করে দিয়েছি। না গেলে আমাদের মান মর্যাদা কিছু থাকবে না। আপনি তো অনেকদিন আগেই আমাদের সেক্রেটারীকে কথা দিয়েছিলেন।'

মনে মনে ভাবলাম কথা দিয়েছিলাম, কিন্তু ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টাও কম করিনি। ভেবেছিলাম রচনাগুলি তাড়াতাড়ি দেখে দিলে সভায় উপস্থিত থাকবার দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি পাব। কিন্তু সব ব্যাপারেই বড় দেরি হয়ে গেছে। তাছাড়া যেখানে ক্লাবের মান মর্যাদা রক্ষার প্রশ্ন—। ছেলেটির উদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে আমি আর অন্য কথা বলতে সাহস পেলাম না।

তাকে বিদায় দিয়ে ভালো ছেলের মত পেনসিল হাতে প্রতিযোগিতার খাতাগুলি নিয়ে বসলাম।

রচনার বিষয় 'একটি বিনিদ্র রজনী।'

প্রত্যেকেই নিজের জীবনের একটি করে রাত জাগার কাহিনী লিখেছেন। সবই উত্তম পুরুষে। বেশির ভাগই দেখলাম আত্মীয়

স্বজনের মৃত্যুর প্রসঙ্গ। কারো বা বন্ধু। মৃত্যুশয্যায় উদ্বেগ ভয় আসন্ন বিচ্ছেদের বেদনায় রাত্রিযাপনের কাহিনী। একজন লিখেছেন বাল্যস্মৃতির কথা। সবান্ধবে গ্রামান্তরে গিয়ে যাত্রার আসরে নেমে রাত ভোর করে বাড়িতে ফিরে এসে অভিভাবকের হাতে কানমলা খাওয়ার বিবরণ। কাল সেই লাঞ্ছনার উপর সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিয়েছে। যাত্রার আসরে দুজন যোদ্ধার দুখানি শাণিত তরবারিই লেখকের মনে বেশি উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে বলে বোধ হল। একজন লিখছেন জীবিকার দায়ে রাত্রি জাগরণের বিবরণ। এক সহকর্মীর সঙ্গে ইঞ্জিনে কয়লা জোগাতে জোগাতে এক নয় এমন শত শত বিনিদ্র রাতই তাঁর কাটাতে হয়েছে, কাটাতে হবে, কিন্তু সবগুলি রাত্রির বিবরণ তো আর লেখা যায় না।

ভাবলাম তাতো ঠিকই। অত কাগজ কোথায় তাছাড়া যারা রোজ সারারাত জাগে তারা কি দিনে লিখবে না ঘুমোবে।

বিষয় বস্তুর দিক থেকে লেখাটি নতুন ধরনের। কিন্তু ভাষা কাঁচা, পদে পদে বর্ণাশুদ্ধি এবং ব্যাকরণবিচ্যুতি। আমি দ্বিধায় দুলতে লাগলাম একে প্রধান গৌরবের আসন দেব কি দেব না।

তারপর আরো কয়েকটি রচনা চোখে পড়ল। একজন লিখেছেন তাঁর ফুলশয্যার রাতের কথা। প্রথম রাত্রিতে কিশোরী নববধূর লজ্জা ভাঙাতে পারেননি। একেবারে শেষ রাত্রে ছিল লগ্ন। আলাপের সুযোগই হয়নি। তা ছাড়া চারদিকে আড়ি পেতে ছিলেন কনের দিদি বউদি ঠানদিদের দল। বাসি বিয়েতে দিন আছে কিন্তু রাত নেই। রাত্রে দেখাসাক্ষাত নিষেধ। তৃতীয় দিন ভোর না হতে হতেই লেখকের আসন্ন রাত্রির কথা মনে পড়ছে। কিন্তু ভোরের পরেই তো আর রাত আসে না। একটি বিরহরজনী কাটাবার পরেও রোদ আস্তে আস্তে ওঠে। বেলা ধীরে ধীরে বাড়ে যেন কোন গরজ নেই। ফুল শয্যার যে ফুল তারও এলটি দীর্ঘ বোঁটা আছে। আষাঢ়ের বেলা যাই যাই করেও যায় না। আকাশের মেঘ মাঝে মাঝে আসন্ন সন্ধ্যার আভাষ দেয়

কিন্তু খানিক পরেই সরে গেলে দেখা যায় রোদ চিকচিক করছে। পরিহাসরসিকা বউদির হু চোখের কৌতুকের মত। তারপর আষাঢ়ের সেই দীর্ঘদিনও শেষ পর্যন্ত কাটল। সন্ধ্যা হল। শুরু হল বউভাতের ঝামেলা। মিষ্টান্নলোভী আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব ছাদের ওপর পাত পাতলেন। গুণতিতে অসংখ্য। লেখকের বাবা আর দাদারা তাঁদের আদর আপ্যায়নে পঞ্চমুখ। কিন্তু লেখকের মুখ ভার। আজও রাত বারোটা পার হল। যৌতুকে পাওয়া নতুন ঘড়িটির দিকে তিনি বারবার তাকান আর ভাবেন ফুল-শয্যাতেও এত কাঁটা।

রাত প্রায় একটার সময় শোবার ঘরে ডাক এল। তখনো ঘরে বোন আর বউদিদের ভিড়। আচারে স্ত্রীলোকের শ্রান্তি নেই। শেষ পর্যন্ত ভিড় ভাঙল, দয়া হল ওদের। ঘরে এখন শুধু লেখক আর তাঁর জীবন সঙ্গিনী। কিন্তু শয্যার দিকে এগোতে তাঁর অসীম লজ্জা। লেখকই আস্তে আস্তে এগিয়ে এলেন। বিদ্যুৎবাতি নিবিয়ে দিলেন। সাধাসাধি কবে নববধূকে তাব নিজের জায়গায় নিয়েও এলেন। কিন্তু তার বেশি এগোতে সাহস পেলেন না। এত শিক্ষা, এত প্রতীক্ষা সবই বৃথা হতে চলল। বিবাহিত অভিজ্ঞ বন্ধুবান্ধবের এত পরামর্শ কিছুই কাজে এল না। একটু এগোতে গিয়ে মনে হয় মেয়েটির সঙ্গে আলাপ নেই পরিচয় নেই যদি সে তাঁকে অভদ্র ভাবে কি অতিমাত্রায় অভিজ্ঞ বলে মনে করে। ছি ছি ছি তাহলে বড় লজ্জার কথা হবে। কিন্তু পিছিয়ে থেকেও স্বস্তি নেই। প্রতি মুহূর্তেই আশঙ্কা মেয়েটি তাঁকে নিতান্ত আনাড়ি মনে করছে। প্রথম রাত্রেই স্ত্রীর কাছে যদি এমন বোকা বনে যান তাহলে জীবনের বাকি রাতগুলির দশা কি হবে। রাত বাড়তে লাগল, শেষ হতে চলল লেখক আকুল হয়ে উঠলেন। কোন বিদ্যাই কাজে লাগছে না। পরীক্ষা দিতে এসে ছাত্র যেন দেখতে পেয়েছে প্রশ্নগুলি চেনা জায়গা থেকেই এসেছে। কিন্তু বড় ঘুরোন জড়ানো ভাষা। নোট মুখস্থ উত্তরগুলি



বসাতে ছাত্র ভরসা পায় না যদি ঠিক ঠিক না লাগে। আবার ত্বকলম যে বানিয়ে লিখবে সে সাহসও নেই, যদি গ্রামার ঠিক না হয়।

সেই মূঢ় ছাত্রের মত লেখক সারারাত জেগে একখানি ব্লাঙ্ক পেপার সাবমিট করলেন। খাতার কোথাও একটি কলমের আঁচড় দিতে পারলেন না।

শেষ রাত্রে চাঁদ উঠল। চাঁদের আলো বিছানার ফুলের সঙ্গে জড়িয়ে গেল। পড়ল আরো একজনের মুখে যে সোনার অলঙ্কারে সেজেছে, ফুলের অলঙ্কারেও সেজেছে। ফুল শয্যায় বউ এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। লেখক চেষ্টা করলেন তার ঘুম ভাঙাতে। কিন্তু কিছুতেই পারলেন না। যে জেগে ঘুমোয় তার ঘুম কি ভাঙানো যায়। তাই একজনের ছদ্ম নিদ্রা দেখতে দেখতে আর একজনের বিনিদ্র রজনী ভোর হয়ে গেল।

কাহিনী শেষ করে আমি একটু হাসলাম। বিষয় মামুলী, ভাষা আর ভঙ্গি দুইই হালকা। তবু লেখার মধ্যে মুন্সীয়ানা আছে। এই প্রতিযোগীকেই বোধ হয় প্রথম আসনে বসাতে হবে।

আরো কয়েকটি কাঁচা রচনা সরিয়ে রাখবার পর আর একটি দাম্পত্য গল্প চোখে পড়ল। ফুল শয্যার রাত নয়। তারপর অনেক দিন অনেক রাত্রি চলে গেছে। লেখক লিখেছেন তাঁর মধ্য বয়সের গল্প। মধ্য বয়সের এক দাম্পত্য রজনী। তার আগের কয়েক রাত ধরে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া। কারণ দারিদ্র্য, অনটন। মাসের শেষ সপ্তাহে বাজার করবার টাকা নেই, বাড়িওয়ালা বাকি ভাড়ার জন্যে দুদিন বাদে বাদেই এসে অপমান করে যাচ্ছে, মেজো মেয়েটার টাইফয়েড, এমন সময় স্ত্রী যদি বলে ঘরে চাল বাড়ন্ত তাহলে পুরুষের কি খুন করতে ইচ্ছা হয় না? লেখকেরও সেই সাধ হয়েছিল। চেয়েচিন্তে চালের জোগাড়টা তিনি অবশ্য শেষ পর্যন্ত করলেন, কিন্তু ঝগড়া মিটল না। শুধু চাল পেয়েই স্ত্রী সন্তুষ্ট নন। তাঁর আরো চাই। তেল, নুন, ডাল তরকারি চাই।

রোগা মেয়ের জন্যে ওষুধ পথ্য দরকার। কোনটা বাদ দিলেই চলে না। লেখক বলেন, 'তোমার অত খাঁই আমি মেটাতে পারব না।' স্ত্রী তাঁর চোয়ালজাগা মুখখানা বিকৃত করে বললেন, 'আমার খাঁই, না তোমার ছেলেমেয়েদের? কেন বিয়ে করবার সময় মনে ছিল না! ছটি সন্তানের বাপ হওয়ার সময় মনে ছিল না যে তাদের খাওয়াতে হবে পরাতে হবে অসুখ বিসুখ হলে চিকিৎসা করতে হবে?'

স্বামী বললেন, 'সবই মনে ছিল। কিন্তু তোমার মুখ নাড়া খেতে খেতে নিজের বাপের নাম পর্যন্ত ভুলেছি। যা দজ্জাল মেয়ে মানুষ তুমি।'

স্ত্রী বললেন, 'তুমি আবার পুরুষ নাকি! পুরুষ হলে নিজের স্ত্রীকে অমন দুর্ণাম দিতে না।'

দিন নেই রাত নেই রোজ ঝগড়ার ঝড় বয়ে যায়। স্বামী বলেন, তোমার মত অলক্ষ্মীকে ঘরে এনেই আমার এই দশা।'

স্ত্রী বলেন, 'তোমার মত অক্ষম পুরুষের হাতে পড়ে আমার জীবনে কোন সুখও হল না শান্তিও হল না।'

ছেলে মেয়েদের মধ্যে যারা বড় তারা ঝগড়ার সময় বাইরে চলে যায় যারা ছোট তারা অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকে। অপেক্ষা করে কখন এই ঝড়ের ঝাপটা থামবে।

একদিন অফিস বেরোবার সময় স্বামী ঝগড়ার মুখে চরম অভিসম্পাত দিয়ে গেলেন 'মর মর মর। বিষ খেয়ে হোক, গলায় দড়ি দিয়ে হোক, জলে ডুবে হোক যে ভাবে পার আমায় নিষ্কৃতি দিয়ে যাও।'

'মরব?'

'হ্যাঁ।'

'মরব?'

'হ্যাঁ।'

'মরব?'

স্বামী এবারও বিনা দ্বিধায় বললেন, 'হ্যাঁ।'

স্ত্রী বললেন, 'তিন সত্যি করলে। ফিরে এসে আমার মুখ আর তুমি দেখতে পাবে না।'

অফিসে এসে টিফিনের আগে পর্যন্ত ভালোই কাটল। রাগটা তখনো মেটেনি। স্বামী মনে মনে ভাবলেন যদি মরে বেশ হয় আমার হাড় জুড়োয়। কিন্তু টিফিনের সময় কৌটোটি খুলে মন বড় খারাপ হয়ে গেল। অন্যদিনের মতই সেই কখানা আলুর কুচি আর দুখানা রুটি দেখে শাঁখা পরা এক জোড়া শীর্ণহাতের কথা তাঁর মনে পড়ল।

ইচ্ছা হল তখনই চলে আসেন কিন্তু পারলেন না। কাজের চাপ অনেক বেশি। টেবিলে গাদা গাদা এরিয়ার ফাইল পড়ে রয়েছে। শেষ করতে করতে সন্ধ্যা। সহকর্মীর কাছ থেকে দুটি টাকা ধার করে তিনি বেরিয়ে এলেন। বৈঠকখানার বাজার থেকে মাছ কিনলেন, মনোহারী দোকানটার সামনে দাঁড়িয়ে হঠাৎ কি মনে হল এক শিশি আলতাও নিলেন সস্তা দেখে। স্ত্রী একদিন বলেছিলেন, 'জলে জলে পা দুটো খেয়ে গেছে। পচে গন্ধ হয়েছে। এক শিশি আলতা এনো তো।'

বাজার নিয়ে স্বামী হাসিমুখে ঘরে এলেন। কিন্তু ঘর অন্ধকার। আলো জ্বালাবার কেউ নেই না কি ?

ছোট মেয়েটাকে ডেকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'পুঁটি তোর মা কোথায় রে ?'

আট বছরের মেয়ে ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, 'বাবা, মা নেই।'

পুঁটির বাবার বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল, 'নেই কিরে— হতভাগা মেয়ে। কোথায় গেছে তাই বল।'

পুঁটি কাঁদো কাঁদো ভাবে বলল, 'মা বলল আমি মরতে চললুম।'

আমি বললাম, 'আমরা কার কাছেথাকব।' মা বলল, 'তোদের বাপের কাছে থাকিস। আমি মরে গেলে সেই তোদের বাপও হবে, মাও হবে। তোদের আলাদা মার আর দরকার নেই।'

ছেলেরা তাকে খুঁজতে বেরিয়েছে। কিন্তু কেউ এখনো ফেরেনি। ভদ্রলোক মাছ আর আলতার শিশি নামিয়ে রেখে স্ত্রীকে খুঁজতে বেরোলেন। ঝগড়ার কথা তো বাইরের লোককে বলা যায় না। তবু পাড়াপড়শীর বাড়িতে বাড়িতে গেলেন। কৌশলে পলাতকা স্ত্রীর সন্ধান নিলেন। কিন্তু কারো বাড়িতে তিনি যান নি। গঙ্গার ধারে গেলেন। সেখানেও কোন চিহ্ন নেই। জন দুই লোক বসে বিড়ি খাচ্ছে আর খোসগল্প করছে। তাদের জিজ্ঞেস করলেন কোন স্ত্রীলোককে তারা জলের ধারে যেতে দেখেছেন কিনা। একজন কোন জবাব দিল না আর একজন হেসে বলল, 'আরে দাদা ওই মতলব নিয়ে যদি কেউ এসেই থাকে তাহলে কি সে আর লোক দেখিয়ে জলে ঝাঁপ দিয়েছে? যেতে হলে চুপি সারেই চলে গেছে।'

ভদ্রলোক শূন্যবুকে ভরা গঙ্গার দিকে তাকিয়ে রইলেন। মনে মনে ভাবলেন, 'মা গঙ্গা যদি তাকে নিয়েই থাকেন, কোন চিহ্ন রেখে দেবেন কেন?'

পা যেন পাথরের মত ভারি, নড়তে আর চায় না। মন যেন পাহাড়ের মত স্থবির, চলতে আর পারেন না। হয় তো মিনিট পাঁচেকের বেশি তিনি সেখানে দাঁড়ান নি। কিন্তু মনে হল যেন যুগের পর যুগ চলে গেছে। একজন আর একজনকে ছেড়ে ওপারে চলে গেছেন। যিনি পড়ে রইলেন তাঁর আর স্বেচ্ছায় পার হবার সাধ্য নেই। শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক একটি করে ঢেউ গোনা ছাড়া আর কিছু করবার নেই তাঁর।

এই অবস্থায় থানায় একবার যাওয়া দরকার আর হাসপাতালে। যদি জলে ঝাঁপ দেওয়ার পর কেউ তাকে তুলে থাকে, কি গাড়ি চাপা পড়বার পর কেউ যদি কুড়িয়ে নেয়। কিন্তু তাঁর কেবলই মনে হতে লাগল কি হবে আর চেষ্টা করে যে গেছে তাকে আর পাওয়া যাবে না। থানা কি হাসপাতালে একা যেতে ভরসা হল না। ভাবলেন বড় ছেলেকে কি কোন প্রতিবেশী বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে বেরোবেন।

এগলি ওগলি ঘুরে পাথরে গড়া পা দুখানি টেনে টেনে তিনি কোন রকমে বাড়ির সদর দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। এখনো কোনো সাড়াশব্দ নেই। সময় বুঝে রাস্তার সব আলো নিভে গেছে। পাড়াসুদ্ধ অন্ধকার।

ভদ্রলোক হাতড়ে হাতড়ে কোন রকমে কড়াটা নাড়লেন। বুঝতে পারলেন না শব্দ হল কিনা। নিজের বুকের ঢিপ ঢিপ শব্দই বেশি করে কানে আসতে লাগল।

যে কোন শব্দেই হোক দরজাটা খুলে গেল। তিনি দেখলেন এক টুকরা জ্বলন্ত মোমবাতি হাতে ছায়ার মত একটি নারী। আঁধারের মধ্যে এক ক্ষীণ দীপশিখা।

তিনি অপলকে সেই শিখার দিকে তাকিয়ে রইলেন। কতক্ষণ যে গেল তার আর ঠিক নেই।

অমন করে তাকালে কোন মেয়ে কি চোখ না নামিয়ে নিয়ে পারে? তা তার রূপ থাকুক আর না থাকুক, যৌবন যত আগেই বিদায় নিয়ে চলে যাক।

একটু বাদে ফের চোখ তুলে স্ত্রী বললেন, 'সারারাত দাঁড়িয়েই থাকবে নাকি? ভিতরে এসো।'

ভদ্রলোক এবার হেসে বললেন, 'বড় বউ, তবে যে বলেছিলে মরবে!'

তাঁর স্ত্রী বললেন, 'চেষ্টা কি আর করিনি ভেবেছ? পারলাম না। কাচ্চা বাচ্চার বেড়ি দিয়ে আমাকে যমের হাত থেকেও কেড়ে রেখেছ। তুমি আমার এত বড় শত্তুর।'

সেই রাত্রে তাঁরা ভোর না হওয়া পর্যন্ত জেগে ছিলেন। স্বামী ও শ্রান্ত, স্ত্রীও শ্রান্ত কিন্তু আশ্চর্য, তবু কারো চোখে ঘুম আসে নি।

একটু ভেবে এই গল্পটিকেই আমি সবচেয়ে বেশি নম্বর দিলাম। যদিও বর্ণনায় অতিরঞ্জন আছে, ঘটনার বিন্যাসে কিছু কিছু শৈথিল্য, তবু যতগুলি রচনা পেয়েছি তাদের মধ্যে এই লেখাটিই সবচেয়ে ভালো।

কিন্তু শুধু বিচারপর্বেই কর্তব্য শেষ হল না। পরদিন বিকালে সহকারী সম্পাদকের সঙ্গে আমাকে তাঁদের অফিসেও যেতে হল। সভাপতিকে নিজের মুখে ফল ঘোষণা করতে হবে, স্বহস্তে পুরস্কার প্রদান।

হলঘরের অর্ধেক জুড়ে প্রতিযোগীরা বসেছেন। সবাই রেলওয়ের নানা বিভাগে কাজ করেন। বেশির ভাগই কেরানী। কিন্তু আজ তাঁদের অন্য ভূমিকা। আজ তাঁরা কেউ জীবিকার জন্যে কলম ধরেন নি। নিজের জীবনকে শিল্পরূপ দিয়েছেন। সামনের সারিতে কয়েকটি মহিলা এবং পদস্থ অফিসারকেও দেখা গেল। তাঁরা বিশেষভাবে নিমন্ত্রিত।

ক্লাবের সম্পাদক মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে সংক্ষিপ্ত বার্ষিক বিবরণী পাঠ করলেন। এর আগে তাঁরা রবীন্দ্র-জয়ন্তী করেছেন আর একবার তরুণ কবিদের সম্মেলনের ব্যবস্থা করেছিলেন। ক্লাবেরই একজন সদস্যের লেখা একখানি নাটক অভিনয় করবার ইচ্ছাও তাঁদের আছে।

এবার আমাকেও কিছু বলতে হল। বললাম, প্রতিযোগিতায় যাঁরা যোগ দিয়েছেন তাঁরা আসলে সহযোগী। এই অনুষ্ঠান তাঁদের সকলের চেষ্টায় সার্থক হবে। তাঁদের প্রত্যেকের রচনাই অনন্য। এক লেখকের সঙ্গে আর এক লেখকের তুলনা সঙ্গত নয়। এমনকি একই লেখকের এক গল্পের সঙ্গে আর এক গল্পের তুলনা চলে না। কারণ একেকটি লেখা তাঁর স্বতন্ত্র অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর। যত লেখা তত লেখক।

আমি মুখবন্ধ শেষ করবার পর ক্ষীণকায় সেক্রেটারী ফাইল হাতে মাইকের সামনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, 'সভাপতির বিচারে প্রতি-যোগিতায় প্রথম হয়েছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রবীণ বন্ধু বামাপদ দাশ। তাঁকে ক্লাবের পক্ষ থেকে আমরা একটি রৌপ্যপদক উপহার দিচ্ছি।'

বেঁটে মত এক ভদ্রলোক হাসিমুখে মঞ্চের সামনে এগিয়ে এলেন। বয়স পঞ্চাশ পার হয়ে গেছে। মাথার চুল বেশির

ভাগই পাকা। সামনের সারির গুটি তিনেক দাঁত নেই। তিনি মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমার সহকর্মীরা আমাকে যে গৌরবে আজ ভূষিত করলেন তা আমি জীবনে আর কোনদিনই পাই নি। কোনদিন স্কুল কলেজের পরীক্ষায় আমি পুরস্কার পাই নি, কোন কাজের জন্যে প্রশংসা শুনিনি, এমন গৌরব আমার এই প্রথম। এই বুড়ো বয়সে প্রতিযোগিতায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছা আমার ছিল না। আমি লেখকও নই। জীবনের একটি সত্য ঘটনাকে কোন রকমে আপনাদের সামনে ধরে দিয়েছি মাত্র। তরুণ সেক্রেটারী আমাকে না জানিয়ে লেখাটিকে প্রতিযোগিতার ফাইলে বেঁধে ফেলেছেন।'

এরপর তিনি তাঁর লেখাটি পড়তে শুরু করলেন। কিন্তু দুপাতা এগোতে না এগোতেই আবেগে তাঁর গলা রুদ্ধ হয়ে এল, চোখদিয়ে ঝরঝর করে জল পড়তে লাগল। তিনি বারবার পড়তে চেষ্টা করলেন, কিন্তু কিছুতেই লেখাটি শেষ করতে পারলেন না। শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে নিজেই বললেন, 'আর কেউ দয়া করে লেখাটি পড়ে দিন।'

সেক্রেটারীর ইঙ্গিতে একজন সুদর্শন যুবক রচনার বাকি অংশ পড়ে শোনালেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ভালো, উচ্চারণ বিশুদ্ধ।

কিন্তু পাঠক গল্পের শেষে এসে পৌঁছতে না পৌঁছতে লেখক ফের কান্নার সুরে বলে উঠলেন, 'আমি তাঁকে বাঁচাতে পারি নি। শেষ পর্যন্ত সে আমাকে ছেড়ে চলে গেছে।'

আমি একটুকাল অবাক হয়ে থেকে বললাম, 'কি ব্যাপার। তবে কি আপনার স্ত্রী সেই রাত্রেই—'

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে বাধা দিয়ে বললেন, 'না স্যার, তা নয়। আমি এক বর্ণও মিথ্যে লিখি নি। সেদিন সে সত্যিই ফিরে এসেছিল। কিন্তু গত বছর দুদিনের জ্বরে সে আমাকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে। কী যে হল ডাক্তার মোটে ধরতেই পারল না।'

ভদ্রলোক ফের বসে পড়ে মুখ নিচু করে রইলেন। চোখে কিছু না দেখা গেলেও সবাই বুঝতে পারল তিনি কাঁদছেন।

নীরব অস্বস্তির মধ্যে সভার কয়েকটি মুহূর্ত কাটল।

একটু বাদে সহকারী সম্পাদক তাঁকে সাহিত্য সভা থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। ফেলে যাওয়া মেডেলের বাক্সটিও তিনি তুলে নিলেন।

সেদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আমার মনে হল ভদ্রলোকের আর একটি বিনিদ্র রজনীর ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু তিনি কি আর দ্বিতীয় গল্প লিখতে পারবেন?

হঠাৎ আমাদের সবাইকে চমকে দিয়ে ক্লাবের সেক্রেটারী মাইকের সামনে মুখ নিয়ে ঘোষণা করলেন, 'এবার গল্প পড়বেন শ্রীবীরেন্দ্রকুমার তালুকদার। তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন। আমরা তাঁকে একটি কলম উপহার দিচ্ছি। তিনি লিখেছেন তাঁর ফুলশয্যার রাতের গোপন কথা।'

সামনের সারিতে যে কয়েকটি সাশ্রুনয়না মহিলা বসেছিলেন তাঁদের মুখে এবার হাসি ফুটল।

নতুন স্বাদ

বছরের শুরুতেই তিন দিন ক্যাজুয়াল লীভ নিয়ে বসল সুধাকর। গত বছর অনেক পাওনা ছুটি নষ্ট হয়েছে। সময় মত নেয়নি, যখন চেয়েছে পায়নি। এবার আর সে ওভাবে ঠকতে রাজী নয়। কিন্তু ছুটি নেওয়ার পরে দেখল বিশ্রাম গ্রহণও বেশ শ্রমসাধ্য। সময় কীভাবে কাটবে সেই এক মহাসমস্যা। সুধাকর তেমন মিশুক প্রকৃতির মানুষ নয়। পাড়াপড়শীর সঙ্গে তার পরিচয় আছে কিন্তু অন্তরঙ্গতা নেই। স্কুল কলেজে যারা বন্ধু ছিল তারা এই কলকাতা সহরেরই এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে কিন্তু সেই বন্ধুত্বের সম্পর্ক কোথাও মৃত, কোথাও বা মুমূর্ষু। এর জন্যে সুধাকর নিজেও অবশ্য কম দায়ী নয়। বড় স্পর্শকাতর অভিমানী মানুষ সুধাকর। কারো সামান্য ঔদাসীন্য, সামান্য ত্রুটিবিচ্যুতি সে সহ্য করতে পারে না। অল্পেই আহত হয়, পালটা আঘাত দিতে না পেরে ভিতরে ভিতরে অস্বস্তি ভোগ করে। তারপর সময়ের প্রলেপে সেই জ্বালা যখন মেটে তখন সম্পর্কেরও কিছু আর অবশিষ্ট থাকে না।

এমনি ক'রে আত্মীয় কুটুম্ব বন্ধুদের জগৎ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন নির্বাসিত হয়ে পড়ছে সুধাকর। বয়স এখনো চল্লিশ ছাড়ায় নি কিন্তু এরই মধ্যে তার গুরুভার সে অনুভব ক'রতে শুরু করেছে।

সুধাকর বাইরে যেমন নির্বান্ধব ঘরেও তেমনি নিঃসঙ্গ। জীবন-সঙ্গিনী হিসেবে অমিতা অবশ্য পনের বছর ধরে সঙ্গেই রয়েছে। কিন্তু একজন আর একজনকে সয়ে নিয়েছে এই পর্যন্ত। কেউ কারো নিঃসঙ্গতা ঘোচাতে পারে নি। দুই দ্বীপের মাঝ খানে মিলনের সেতুবন্ধ রচনা করতে পারত যে সন্তান তা আজও আসে

নি। ক্রমে তু'জনের ব্যবধান আরো বেড়েছে। সুধাকর শরণ নিয়েছে বইয়ের, অমিতা আশ্রয় নিয়েছে সিনেমা, রেডিও এবং ধর্মচর্চার। স্ত্রীর এই ধর্মবিশ্বাস এবং আচরণ অনুষ্ঠানকে সুধাকর বহু যুক্তিতর্কে নিবারণ করতে চেষ্টা করেছে, না পেরে ব্যঙ্গ বিদ্রূপে বিদ্ধ করেছে, কিন্তু কিছুতেই কিছু ফল হয় নি। অমিতা বলেছে, 'তোমার অধর্ম অবিশ্বাসকে আমি যদি সইতে পারি, আমার ধর্মকেই বা তুমি পারবে না কেন?' সুধাকর বলেছে, 'কিন্তু তু'জনের মধ্যে কিছু মিল তো থাকা চাই।'

অমিতা জবাব দিয়েছে 'এত অমিল নিয়ে যদি পনের বছর ঘর করতে পারলুম এটুকু অমিলেও কিছু এসে যাবে না।'

সুধাকর হাল ছেড়ে দিয়েছে। মাঝে মাঝে অবশ্য সুধাকরের মনে হয় এই নিয়ে এত হৈ চৈ করবার কোন মানে হয় না। অমিতা যেমন শাড়ি গয়না ভালোবাসে, সিনেমা রেডিওর লঘুসঙ্গীত ভালোবাসে, সস্তা সেন্টিমেন্টাল নভেল ছাড়া যেমন ও আর কোন বই থেকে আনন্দ পায় না তেমনি ঈশ্বর উপবাস ব্রত পূজা পার্বণও না হয় ওর গয়নার বাক্সের মত নিজস্ব রুচির বস্তু হয়ে রইল। তু'জনের মনে যদি সত্যিকারের ভালোবাসা থাকে তাহলে গয়নার প্যাটার্ণ সম্বন্ধে মতভেদটা খুব অসহ্য হয় না। কিন্তু প্রেমের যেখানে অভাব সেখানে ছোটখাট বিভেদ বৈষম্যকেও তুস্তর মনে হয়।

ছুটির তৃতীয় দিনে অমিতা যখন তার প্রতিবেশিনী মাসিমাকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে চলে গেল সুধাকর ঘরে বসে বসে এই কথা-গুলিই ভাবতে লাগল। সত্যি, ছুটি না নেওয়াই ভালো ছিল তার। যার তাস নেই, পাশা নেই, বন্ধু নেই, বান্ধবী নেই, থিয়েটার সিনেমায় যার উৎসাহ নিতান্তই যৎকিঞ্চিৎ সে ছুটি নিয়ে কি করবে। মার্চেন্টস অফিসের একাউন্টস ডিপার্টমেন্টই তার পরম বন্ধু। বই অবশ্য আছে। কিন্তু কোন কোন সময় অমৃতেও অরুচি হয়। অশান্ত চঞ্চল মন পাঠের উপযোগী নয়। বসে বসে

সুধাকরের কেবলি মনে হতে লাগল গত বছর যেমন ছুটি না নিয়ে ঠকেছিল এ বছর তেমনি ছুটি নিয়েই সে ঠকতে শুরু করল।

খানিকক্ষণ বাদে এই নিঃসঙ্গতা সুধাকরের কাছেও অসহ্য হয়ে উঠল। জনতা সে ভালোবাসে না কিন্তু তাই বলে নির্জনতাও তার প্রিয় নয়। সে চায় একজনকে। নারী হোক, পুরুষ হোক এমন একান্ত এক মনের মানুষ যার মধ্যে সুধাকর অন্তত কিছুক্ষণের জন্যেও ডুবে যেতে পারে। যার সান্নিধ্য ভালো লাগবে, যার সঙ্গসুধারস সে উপভোগ করবে। কিন্তু তেমন মানুষ বিরল, তেমন মুহূর্ত বিরল। সুধাকরের কেবলই ভয় হয় নিজের বোঝা অন্যের ওপর চাপিয়ে দিয়ে সে আর একজনের অপ্রীতিভাজন হচ্ছে। মুখ ফুটে সে হয়তো কথাটা বলতে পারছে না, কিন্তু তার চোখে মুখে বিরক্তি আর অনুকম্পার ছাপ ফুটে উঠছে। সুধাকরকে তো কেউ ডাকে না, কেউ চায় না। সে কেন অনাহূতভাবে আর কারো ওপর গিয়ে চড়াও হবে ?

কিন্তু ঘরে বসে থাকাও দুঃসহ। খানিকক্ষণ নিজের মনে ছট্‌ফট্‌ করতে করতে বেরিয়ে পড়াই ঠিক করল সুধাকর। কাপড় বদলাল, পাঞ্জাবীটা গায়ে দিল। ঘরের জানালাগুলি বন্ধ করল। তারপর বেরিয়ে এসে দরজায় বড় সীসার তালাটা লাগিয়ে দিল। দুটো চাবির একটা অমিতার কাছে থাকে। তাই সুধাকর যখনই ফিরুক ঘরে ঢুকতে অমিতার কোন অসুবিধা হবে না।

বিশ্ব ঘোষ লেন থেকে শ্যামবাজারের মোড় পর্যন্ত আসতেই জনতার মুখোমুখি হ'ল সুধাকর। মুখোমুখি ঠিক নয়, পার্ক ঘেঁষে দাঁড়াল। এই জনতা তার স্বদেশের, কিন্তু এদের মধ্যে তার স্বজন কেউ নেই। অবশ্য সে যদি এই মুহূর্তে গাড়ি চাপা পড়ে কি কোন গুণ্ডা তার ঘড়ি পেন কি পকেটের গোটা টাকার লোভে তাকে আক্রমণ ক'রে বসে তাহলে অবশ্যই অনেকে ছুটে আসবে, সহানুভূতিও দেখাবে। কিন্তু তেমন কিছু একটা না ঘটলে কেউ তার দিকে ফিরেও তাকাবে না। অচেনা লোকের এই নিস্পৃহ

ঔদাসীন্য যেমন তাকে পীড়িত করে তেমনি চেনা মানুষের হৃদয়-সম্পর্কহীন সাধারণ ভদ্রতাও তাকে কম বিব্রত করে না। সুধাকর কামনা করতে লাগল, তেমন কোন পরিচিত লোকের সঙ্গে যেন তার দেখা হয়ে না যায়। তার চেয়ে এই অপরিচয়ের জনারণ্য ঢের ভালো।

কিন্তু এই মুহূর্তে কোন একজন পরিচিত বন্ধুর কাছে যেতেই ইচ্ছা করতে লাগল সুধাকরের। এমন কে আছে যার বাড়িতে গেলে সে বিরক্ত হবে না। কাজের ক্ষতি হল বলে মনে করবে না। যার সঙ্গে খানিকক্ষণ অসংকোচে গল্পটল্প করতে পারবে সুধাকর। হৃদয়ের গভীর কোন কথা না যদি হয় নাই হল। সাধারণ রাজনীতি, বাজার দর আবহাওয়া যে কোন চলতি প্রসঙ্গ নিয়ে অন্তত কোন একজন সাধারণ স্তরের বন্ধুর সঙ্গেও দুর্লভ ছুটির শেষ সন্ধ্যাটা কাটিয়ে দেওয়ার বড়ই ইচ্ছা হতে লাগল সুধাকরের। আপন নিঃসঙ্গ অন্তর গহন থেকে বেরিয়ে আসবার জন্যে এই মুহূর্তে তার ইচ্ছার আর বিরাম রইল না।

কয়েকটা নামই মনে এল। বউবাজারের বীরেন সুর, ভবানীপুরের সুরেন নাগ, বালিগঞ্জের হেমাঙ্গ চাটুয্যে। এরা প্রাক্তন সহপাঠী, কেউ বা ভূতপূর্ব-সহকর্মী। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাউকেই মনঃপূত হয় না সুধাকরের। তাছাড়া প্রত্যেকের বাড়ী বেশ খানিকটা দূরে। এত কষ্ট ক'রে গিয়ে যদি কাউকে না পাওয়া যায় কিংবা তার চেয়েও যা খারাপ যদি ব্যস্ত অবস্থায় পাওয়া যায় তাহলে বিড়ম্বনার আর অন্ত থাকবে না। তার চেয়ে নলিনী সরকার ষ্ট্রীটের শীতাংশু দাসই বরং ভালো। শীতাংশুও মনের কথা বলবার মত নয় সুধাকরের। যদিও কলেজে একসঙ্গেই পড়াশুনা করেছে, শীতাংশুর রুচি অত্যন্ত স্থূল। বইপত্রের ধার ধারে না। পড়বার মধ্যে খবরের কাগজের হেডলাইন পড়ে, কি তেমন কোন রসালো মামলার বিবরণ, সিনেমার বিজ্ঞাপনই শীতাংশুর আগ্রহ জন্মায়। সুধাকর দশ পনের মিনিট তার সঙ্গে আলাপ ক'রেই ক্লান্ত হয়ে

পড়ে। সাংসারিক চিন্তাভাবনা, মা আর স্ত্রীর মধ্যে বনিবনাও না হওয়ার সমস্যার কী সমাধান আছে, ছেলেটা বড় দুরন্ত হয়েছে, মোটেই বই নিয়ে বসতে চায় না, সস্তায় তার জন্যে ভালো কোন টিউটর জোগাড় ক'রে দিতে পারে কিনা সুধাকর, এই নিয়েই হয় তো কিছুক্ষণ আলাপ চালাল। আজকালকার মাষ্টাররা যে পয়লা নম্বর ফাঁকিবাজ হয়েছে, নানা দৃষ্টান্ত দিয়ে শীতাংশু তা প্রমাণ করবেই। পৃথিবীর এমন সব প্রসঙ্গ তুলবে যা নিয়ে সুধাকরের কিছুমাত্র আগ্রহ বা ঔৎসুক্য নেই। তবু এই শীতাংশুই নিজে যেচে সুধাকরের বাড়িতে বেড়াতে যায়, কোন সময় স্ত্রী আর ছেলেমেয়েকেও সঙ্গে নেয়। কিছু দিন দেখা সাক্ষাৎ না হ'লে ফোনে ডাকে, তার বাড়িতে যাবার জন্যে বার বার অনুরোধ করে।—'কি হে ডুমুরের ফুল হয়ে গেলে নাকি? তোমরা তো ঝাড়া হাত পা। ছেলেমেয়ের ঝামেলা নেই। বুড়ো মায়ের প্যানপ্যানানি নেই, দিব্যি আছ। একদিন যুগলে হাত ধরাধরি ক'রে চলে এসো।'

যুগলে সুধাকর কদাচিৎ বেরোয়। আজ তো কোন কথাই ওঠে না। অমিতা আজ তার তীর্থে গিয়ে পৌঁচেছে। আর সুধাকর পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

শীতাংশুরই একবার খবর নেওয়া যায়। মিনিট পাঁচেকের বেশি বসবে না। তাড়াতাড়ি সামাজিক কর্তব্য সেরে চলে আসবে।

দোতলা বাড়ির একতলায় বাসা। কড়া নাড়তে শীতাংশুর স্ত্রীই দোর খুলে দিল। মৃদু হেসে বলল, 'ও আপনি, আসুন ভিতরে আসুন।'

সুধাকর বলল, "শীতাংশু আছে?'

শীতাংশুর স্ত্রী সুলেখা বলল, 'না তিনি এখনও ফেরেন নি।' সুধাকর খানিকটা নৈরাশ্যের সুরে বলল, 'এখনো ফেরে নি? আজ তো শনিবার।'

সুলেখা বলল, 'তাঁর ফিরতে দেরি হয় আজকাল। একটা পার্ট টাইম কাজ নিয়েছেন। তাঁদের আবার শনি রবিবার কিছু নেই।'

শীতাংশু বলল, 'এখবর তো জানতাম না। আচ্ছা, চলি তাহলে, ওকে বলবেন আমি এসেছিলাম।'

সুলেখা বলল, 'তাই কি হয় নাকি? তিনি নেই বলে আপনি বাইরে থেকেই চলে যাবেন?'

অনুযোগের ভঙ্গিতে বেশ একটু মিষ্টতা আছে।

সুধাকর ঘরে ঢুকল।

একই সঙ্গে ড্রইংরুম এবং বেডরুম। জোড়া তক্তপোষে পাতা বিছানা মোটা রঙিন চাদর দিয়ে ঢাকা। তার নিচে ছোট একটা টেবিল। খান তিনেক চেয়ার। তার একটিতে সুধাকর বসে পড়ল।

সুলেখা একটু হেসে বলল, 'অমিতাদিকে নিয়ে এলেন না কেন?' সুধাকর বলল, 'তাকে কি সঙ্গে আনা যায়?'

আরো দু'একটা কথার পর সুলেখা বলল, 'বসুন চা নিয়ে আসি।'

শুধু চা নয়, দু'খানা লুচি একটু হালুয়া আর ছোট ছোট দুটি রসগোল্লাও প্লেটে ক'রে নিয়ে এল সুলেখা।

অভ্যর্থনার এই আড়ম্বরে একটু বিস্মিত হল সুধাকর। এর আগে যে ক'দিন এসেছে শুধু চা-ই জুটেছে এক কাপ ক'রে।

সুধাকর একটু হেসে বলল, 'ব্যাপারখানা কি? আজ কি আপনাদের ম্যারেজ এ্যানিভারসারি?'

সুলেখা লজ্জিত হয়ে বলল, 'আপনিও যেমন। আমাদের ওসব কিছু নেই।'

সুধাকর বলল, 'কিন্তু নিশ্চয়ই একটা কিছু উপলক্ষ আছে। প্লেটভরা খাবার, ফুলদানি ভরা ফুল। মাইনে টাইনে বাড়ল নাকি শীতাংশুর?'

পিছেনের দরজার একটা পাল্লা ধরে সাত আট বছরের একটি ছেলে এতক্ষণ অধীরভাবে অপেক্ষা করছিল। সে এবার বিরক্ত হ'য়ে বলে উঠল, 'আজ আমার জন্ম দিন কাকাবাবু তুমি কিছু জানো না?'

সুধাকর অপ্রস্তুত হয়ে ছেলেটার দিকে তাকাল। এতক্ষণ সে ওকে ভাল ক'রে লক্ষ্যই করে নি। শীতাংশুর ছেলের পরনে আজ ছোট একটি ধুতি, গায়ে নতুন জামা। কপালে চন্দনের কোঁটা।

সুধাকর বলল, 'তাই নাকি? তোমার জন্মদিন নাকি রন্টু?' তারপর সুলেখার দিকে ফিরে বলল, 'এ কিন্তু আপনাদের ভারী অন্যায়। ছেলের জন্মদিন সেলিব্রেট্ করছেন আর আমাদের একবার জানালেনও না।'

সুলেখা লজ্জিতভাবে বলল, 'সে ভাবে কাউকেই জানানো হয় না। শুধু নিজেরা নিজেরা—। আপনার বন্ধুর তো এটুকুও ইচ্ছে নয়। আমিই জোর করে—। 'রন্টু ওখানে দাঁড়িয়ে রইলে যে? কাকাবাবুকে জন্মদিনে প্রণাম করতে হয় না? শিগগির প্রণাম করে এস!'

সুধাকর বলল, 'দেখুন তো কাণ্ড আমি একেবারে খালিহাতে এসেছি।'

সুলেখা বলল, 'তাতে কী হয়েছে। আপনি আশীর্বাদ করুন তাতেই হবে।'

রন্টু বাধ্য ছেলের মত সুধাকরকে প্রণাম করল, তারপর সুলেখাকে বলল, 'মা আমাকে নিয়ে বেড়াতে যাবে বলেছিলে যে চল।'

সুলেখা ছেলের পিঠে হাত রেখে বলল, 'কী করে যাই বল রন্টু। তোমার ঠাকুরমার শরীর ভালো নয় মিণ্টুর জ্বর, কী করে যাই।'

রন্টু অধীর হয়ে বলল, 'ওসব আমি জানিনে। আজ আমার জন্মদিন আমাকে বেড়াতে নিয়ে যেতেই হবে। বলেছিলে না চিড়িয়াখানা দেখাবে—ঘোড়ার ডিম!' রন্টু ডান হাতের বুড়ো আঙুলটি উঁচু করে দেখাল।

সুলেখা বাইরের একজন ভদ্রলোকের কাছে ছেলের এই অশিষ্টতায় লজ্জিত হল। তারপর রন্টুকে প্রচণ্ড এক ধমক দিয়ে বলল 'ছি ছি ছি, পাড়ার বাজে ছেলেদের সঙ্গে মিশে এই শিক্ষা হচ্ছে

তোমার ? কাকাবাবুর সামনে এই রকম আঙ্গুল দেখায় ? ওইরকম মুখ বাঁকিয়ে কথা বলে ? ছি ছি ! জন্মদিন বলে তোমাকে নতুন জামা-প্যান্ট কিনে দিয়েছি, কত কি খাবার ক'রে দিয়েছি, এই তার ফল ?'

মায়ের ধমকে আরো অপমান বোধ করল রণ্টু, তার আক্রোশ আরো বেড়ে গেল। সে দুহাত দিয়ে কপালের ফোঁটা রগড়ে তুলে ফেলল, টেরিকাটা মাথা এলোমেলো করে দিল। তারপর পটাপট্ করে খুলতে লাগল জামার বোতাম, ঠোঁট ফুলিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'আমি চাইনে জামা প্যান্ট, সব ফিরিয়ে নাও। জন্মদিন টন্মদিন ফিরিয়ে নাও। আমি কিচ্ছু চাইনে।'

সুলেখা ধমক দিয়ে বলল, 'অবাধ্য একগুঁয়ে ছেলে। ডাকব ? ডাকব তোমার ঠাকুরমাকে ? আচ্ছা করে দু'ঘা লাগিয়ে দেবেন তবেই ঠিক হবে।'

সুধাকর বলল, 'না না, ছি। ওসব কী বলছেন ! রণ্টু, তুমি আমার কাছে এসো। চল আমরা এক সঙ্গে বেড়িয়ে আসি।' সুলেখা বলল, 'না-না, থাক। আপনাকে বড় বিরক্ত করবে। যা ছেলে হয়েছে একখানা, আপনার বন্ধুকেও বকি। ছেলেপুলের আবদার তো একটু পালতে হয়। ছুটিছাটার দিনে কোথাও যে নিয়ে বেড়ানো তা ওর দ্বারা হবার যো নেই। আর আজ তো একেবারে রাত নটা পর্যন্ত, আফিসের দোহাই আছে। আমি একা ক'দিক সামলাব বলুন। শাশুড়ীর শরীর ভালো না, মেয়েটার জ্বর—।'

সুধাকর সায় দিয়ে বলল, 'সত্যি, আপনার একার পক্ষে তো সম্ভবই নয়। রণ্টু, চল ঘুরে আসি আমরা।'

দু'চোখে জল তখনো টল্‌টল্ করছে রণ্টুর। কিন্তু তারই মধ্যে ফিক্ ক'রে সে একটু হেসে ফেলল। নিচের দু'টি দাঁত পড়ে গেছে। একটি নতুন দাঁতের অগ্রভাগ দেখা যাচ্ছে। আর একটির আসন এখনো শূন্য।

রণ্টু বলল, 'সত্যি যাবে? যাদুঘর চিড়িয়াখানা সব দেখাবে?' সুধাকর বলল, 'চল, একবার বেরোই তো। বেরোলে আমরা সবই দেখতে পারব।'

সুলেখা আরো দু'একবার আপত্তি করল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আঁচল দিয়ে ভালো করে মুখ মুছিয়ে দিল ছেলের নতুন করে মাথা আঁচড়ে দিল। ধুতি ছাড়িয়ে হাফ্ প্যাণ্ট পরাল, জুতো পরাল, তারপর সুধাকরের দিকে চেয়ে কৃতজ্ঞ ভঙ্গিতে একটু হেসে বলল, 'আপনাকে অতিষ্ঠ ক'রে তুলবে আগেই বলে রাখলুম। বেশি দেরি করবেন না যেন।'

রণ্টুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সুধাকর। রাস্তায় খানিক দূর এগিয়েই তার মনে হল ভদ্রতা করতে গিয়ে বড়ই বোকামি ক'রে ফেলেছে। এই বাচ্চা ছেলেটিকে নিয়ে সে এখন কোথায় যায়? বয়স বাড়বার পর কোন ছেলের সঙ্গে মেশেনি। এদের সে এড়িয়েই চলেছে। এদের মনস্তত্ত্ব সে জানে না; এদের চিত্তবিনোদনের রীতিনীতি, উপচার উপকরণের কোন খোঁজই রাখে না সে। সঙ্গী খুঁজতে খুঁজতে সুধাকর কি শেষ পর্যন্ত এই বাচ্চা ছেলেটিকে জুটিয়ে বসল? যত মনের কথা যত হৃদয়ের ভার ওর কাছেই কি জানাতে হবে? মন্দ নয় ব্যাপারটা। নিজের মনেই হাসল সুধাকর। তার মত অসামাজিক অমিশুক রাসভারী মানুষের উপযুক্ত সঙ্গীই জুটেছে বটে।

পিছনে থেকে প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে রণ্টু সুধাকরের হাত চেপে ধরল, 'কাকাবাবু, আমাকে ফেলে যাচ্ছিলে কেন?'

ভারি লজ্জিত হ'ল সুধাকর। নিজের মনে চিন্তা করতে করতে নিজের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হাঁটাই তার অভ্যাস। কাউকে সঙ্গে নিয়ে চলা তার অভ্যাস নেই। ছোট ছেলেকে নিয়ে তো নয়ই।

সুধাকর বল্ল, 'বাঃ ফেলে যাব কেন তুমি তো আমার সঙ্গেই আছ।'

একজন ট্যাক্সিওয়ালা পাশ দিয়ে যেতে যেতে কটু মন্তব্য করে গেল 'কী আক্কেল মশাই আপনার। ছেলেটা একটু হলেই যে অ্যাক্সিডেন্ট ঘটাত। আর দোষ পড়ত আমার।'

সুধাকর এই তিরস্কারের কোন জবাব দিতে পারল না। ভাবল সত্যি তার অযোগ্যতার সীমা নেই। রণ্টুর যদি কিছু একটা ঘটত তা হলে বন্ধুর কাছে মুখ দেখাবার উপায় ছিল না।

সুধাকর রণ্টুর হাতখানা ভাল করে নিজের মুঠোর মধ্যে নিল। ভারি নরম, পাখীর পালকের মত, নাকি মাখনের মত অপূর্ব এক স্নিগ্ধ-স্পর্শ, বা পাখীর পালক ও নয়, মাখনও নয়। কিছুর সঙ্গেই এই স্বাদ এই স্পর্শের তুলনা হয় না।

রণ্টু বলল, 'কাকাবাবু চিড়িয়া-খানায় যাবে তো?'

চিড়িয়াখানা, যাদুঘর এখন আর খোলা নেই, কিন্তু সে কথা বলে রণ্টুর আশাভঙ্গ ঘটাল না সুধাকর। হেসে বলল, 'আচ্ছা চলো যাওয়া তো যাক্। দেখি কোথায় গিয়ে পৌঁছাই। এই ট্রামে উঠি আমরা কেমন?'

কিন্তু রণ্টুব ট্রামে উঠবার মোটেই ইচ্ছা নেই। সে দোতলা বাসে উঠবে সুধাকর পারতপক্ষে বাসের দোতলায় ওঠে না। অ্যাক্সি-ডেন্টের ভয়ে নয় মোটা ভারী শরীর নিয়ে ওই সরু সিঁড়ি বেয়ে তাব পক্ষে ওঠানামা করা অসুবিধা। কিন্তু রণ্টুর উচ্চাকাঙ্ক্ষা বেশি। সে কিছুতেই একতালায় বসবে না, দোতলায় উঠবে।

অগত্যা তাকে সঙ্গে নিয়ে দোতলায় যেতে হল সুধাকরকে। একেবারে সামনের সীটে গিয়ে বসা চাই রণ্টুর! আর জানালার ধারই তার পছন্দ। তারপর চলল অশ্রান্ত প্রশ্নমালা! ওটা কোন্ রাস্তা? ওটা কোন্ বাড়ি? ওটা কোন্ পার্ক? মাঝখানে পুকুর কেন? কারা স্নান করে, কারা সাঁতার কাটে? সুধাকর কি সাঁতার কাটতে জানে? সুধাকর হেসে বলল, 'কই আর সাঁতার শিখলাম রণ্টু? ভাসতেও জানি না, ডুবতেও জানি না। আমি জীবন সমুদ্রে শুধু নাকানি চুবানি খেতেই এসেছি।'

রন্টু জিজ্ঞাসা করল, 'জীবন সমুদ্র মানে কি? সেটা কোথায় আছে? তা কি হেদুয়ার চেয়েও বড়?'

কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে রন্টুকে নিয়ে নেমে পড়ল সুধাকর। বড় বড় বইয়ের দোকানগুলি বন্ধ। কিন্তু ফুটপাতের বহু দোকান রয়েছে। একটাকা দামের দু'খানা ছবির বই কিনে দিল সুধাকর। রন্টু মহাখুশি। চিড়িয়াখানা আর যাদুঘরের কথা সে ভুলে গেছে।

রন্টু বলল, 'কাকাবাবু দু'খানা বই-ই আমার?'

সুধাকর বলল, 'হ্যাঁ, দু'খানাই তোমার।'

রন্টু বলল, 'একখানা মিণ্টুটাকে দেব। ওর জন্মদিনের ঢের দেরি। কিছু না দিলে কাঁদবে। ভারি বোকা।'

সুধাকর হেসে বলল, 'তোমার উদারতার সীমা নেই। ছোট বোনকেও দিয়ো একখানা।'

বই হাতে করে নেওয়া যায় না। একটা ব্যাগ দরকার। রন্টুর জন্য নীল রঙের একটা ব্যাগ কিনল সুধাকর। আর একটা রাঙন পেনসিল! একদিকে নীল অন্যদিকে লাল। ছেলেবেলা থেকেই এই পেনসিল সুধাকরের নিজের খুব প্রিয়। এ পেনসিল এখনো সে ব্যবহার করে। বইয়ের পছন্দসই পংক্তিগুলিকে চিহ্নিত করে রাখে। জীবনের আর তো কোথাও রঙের চিহ্নমাত্র নেই। এই দোরঙা পেনসিলটা দু'দিকে দু'ফোঁটা রঙ ধরে রেখেছে।

হঠাৎ রন্টু চুপে চুপে বলল, 'কাকাবাবু এদিকে সন্দেশ পাওয়া যায় না?'

সুধাকর হেসে বলল, 'যায় বই কি। খাবে? আচ্ছা চল আমার সঙ্গে।'

অপ্রস্তুত হ'ল সুধাকর। সত্যি খাওয়াবার কথাটা তারই আগে মনে পড়া উচিত ছিল।

মিষ্টিরদোকানে গিয়ে রন্টুকে সন্দেশ আর কাঁচাগোল্লা খাওয়াল সুধাকর। এবার সে একটু সাবধান হয়েছে ওকে বেশি মিষ্টি খেতে দিল না। বাড়িতেও নিশ্চয়ই অনেক খাবার টাবার খেয়েছে। বেশি

খেলে অসুখ করতে পারে। খানিকটা রণ্টুর পাতে দিল, আর বেশির ভাগ প্যাকেটে করে ওর ব্যাগে দিয়ে দিল।

রণ্টু খুসি হয়ে বলল, 'বাড়িতে গিয়ে সবাইকে একটা একটা দেব না কাকাবাবু?'

সুধাকর বলল, 'তাই দিয়ো।'

শ্যামবাজারগামী ট্রামবাসে দারুণ ভিড়। খানিকক্ষণ ট্যাক্সির জন্যে অপেক্ষা ক'রল সুধাকর। কিন্তু খালি ট্যাক্সি এসময়ে দুর্ঘট। শেষ পর্যন্ত একটা রিকসায় উঠে বসল। রিকসা পেয়ে মনটা খুসিই হল সুধাকরের। পথ তাড়াতাড়ি ফুরাবে না। অনেকক্ষণ ধরে যাওয়া যাবে। আরো বহুক্ষণ সান্নিধ্য পাওয়া যাবে রণ্টুর।

ঠুন্ ঠুন্ শব্দে রিকসা চলতে লাগল।

একটু বাদে রণ্টু বলল, 'কাকাবাবু, পেনসিলটা যে তোমার পকেটেই রইল। ওটা কি তোমার জন্যে কিনেছ?'

সুধাকর লজ্জিত হয়ে বলল, 'না তোমার জন্যেই।'

তারপর রণ্টুকে নিশ্চিন্ত করবার জন্যে রঙিন মোটা পেনসিলটা ওর ব্যাগে ভরে দিল।

এই পেনসিলকে অবলম্বন করে সুধাকরের মন ঘোর অতীতমুখী হ'ল। যে ছেলেটি তার পাশে বসে আছে বত্রিশ বছর আগের তারই মত আর একটি ছেলেকে খুঁজে বেড়াতে লাগল সুধাকর। কিন্তু তার সন্ধান পাওয়া অত সহজ হ'ল না। সে হারিয়ে গেছে একেবারেই হারিয়ে গেছে। তার সুখ দুঃখ, ভাবনা বেদনার কোন চিহ্নই এখনকার এই প্রৌঢ় আত্ম-কেন্দ্রিক, জীবনভারের দুর্বহ বোঝায় ক্লিষ্ট সুধাকরের মধ্যে পাওয়া যাবে না। তাকে আর চেনবার জো নেই, ফিরে পাওয়ারও জো নেই।

তবু স্মৃতির পথ ধরে অনেকখানি এগোবার চেষ্টা করল সুধাকর। বাল্য কৈশোর পাড়াগাঁয়ে কেটেছে তার। সে সময় সে জায়গায় জন্ম-দিনের কোন অনুষ্ঠান ছিল না। আরো যেন কী কী নিষেধ ঠিক মনে নেই। ঠিক ঠিক, জন্মবারে চুল ছাঁটতে দিতেন না মা, দিতেন

না নখ কাটতে কিন্তু তার আট বছর বয়সে কেউ কি তাকে এমন সঙ্গে করে বেড়িয়েছে ? ঠিক মনে পড়ছে না। বাবা ছিলেন না, কাকা ছিলেন না। ছেলেবেলা থেকে মামা বাড়িতে মানুষ। বড়মামা খুব বদরাগী ছিলেন এইটুকু মনে আছে। তবু কোন বয়স্ক আত্মীয় কি পারিবারিক বন্ধুর সান্নিধ্য নিশ্চয়ই পেয়েছে সুধাকর। কিন্তু আট বছর বয়সে বিশেষ একটি দিনে, বিশেষ কোন একটি মুখের কথা, কারো সহৃদয় অন্তরঙ্গ ব্যবহারের কথা, কিছুতেই মনে পড়ছে না সুধাকরের। সে অসহায়ভাবে স্মৃতির ভাণ্ডার খুঁজে বেড়াতে লাগল। কিন্তু এই মুহূর্তে কিছুই মনে পড়ল না। আর হঠাৎ সুধাকরের মনে হল রণ্টুরও তো এমন হবে। বড় হয়ে এই দিনটির কথা সেও আর মনে রাখতে পারবে না, সেও ভুলে যাবে সুধাকরকে। কিন্তু সুধাকর ভুলবে না। মৃত্যুদিন পর্যন্ত এই জন্মদিনটির কথা সে মনে করে রাখবে। এই বই ব্যাগ আর পেনসিল। আর জন্মদিন শুধু রণ্টুর নয়, সুধাকরেরও।

সুধাকর রণ্টুর পিঠে হাত রাখল। এই স্পর্শের ভিতর দিয়ে সে অনুভব করতে চায় সে আর রণ্টু অভিন্ন।

দুজনের জন্মদিন এক। অনাস্বাদিত এক অপ্রসন্নতায় মন ভরে উঠল সুধাকরের। মনে পড়ল স্ত্রীর কথা। দুঃখ বোধ করল তার জন্যে। সেও হয়তো কিছু না পেয়েই অমন উত্তর দক্ষিণে ছট্‌ফট্ করে বেড়াচ্ছে।

রণ্টু হঠাৎ তাকে একটা ধাক্কা দিয়ে বলল, 'কাকাবাবু তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে, ঠিক মিণ্টুর মত। মিণ্টুটা রোজ খাওয়ার আগে ঘুমিয়ে পড়ে। তুমিও তো তাই।'

সুধাকর এই অপবাদ স্বীকার করল না। হেসে বলল, 'না না ঘুমোব কেন ? আচ্ছা রণ্টু আমরা যদি আর একদিন বেড়াতে আসি কেমন হয় বলতো ?

উল্লাসে উত্তেজনায় রণ্টু সুধাকরের হাত চেপে ধরল, 'খুব ভালো হয় কাকাবাবু। সত্যি আসবে ? জন্মদিন ছাড়া আর একদিন।

তারপর একটু মুখ ভার করে বলল, 'জন্মদিন যে বছরে একদিনের বেশি আসে না।'

সুধাকর নিজের মনে বলল, না রণ্টু! আনতে পারলে সে প্রতিদিনই আসে।

একক

সকালের ডাকে শুভ বিবাহ মার্কা সাদা খামের মধ্যে লালরঙের চিঠিখানা পেয়ে যোগেশ্বর অবাক হয়ে গেলেন। আরে জিতেনের বিয়ে। পরিষ্কার লেখা আছে জিতেন্দ্র নাথ সরকার, বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীট। কোন ভুল নেই এ জিতেন তাঁদেরই জিতেন। কিন্তু কাণ্ড দেখ লোকটার! এই একান্ন বছর বয়সে প্রথম বিয়ে করতে যাচ্ছে। পঞ্চাশোর্ধ্বে যার বসে খাবার কথা, কনে বউয়ের হাত ধরে সে ঢুকছে বাসরঘরে। যোগেশ্বর মনে মনে বললেন, 'আহাম্মক, বে-আক্কেল কোথাকার। এই বয়সে টোপর মাথায় দিলেই কি আর টাক ঢাকা পড়ে? বুঝবে মজা।'

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চিঠিখানা তবু দেখতে লাগলেন যেগেশ্বর, 'এসো বন্ধু আমাদের মিলন বাসরে' এ ধরনের চিঠি নয়। জিতেনের বড় ভাই স্থুরেনবাবু অভিভাবক হয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ের নিমন্ত্রণ করেছে। প্রজাপতি সিঁদুরের ফোঁটা কিছুই বাদ পড়েনি। অবাক কাণ্ড! এই বয়সে এতখানি সখও প্রাণে পুষে রেখেছিল জিতেন সরকার।

সাড়ে আটটা বেজে গেছে। এখনই স্নান করতে নামলে ভিড়ের মধ্যে ঠেলাঠেলি আরম্ভ হয়ে যাবে। দুটো কল আছে। কিন্তু তাতেও জলের অকুলান হয়। জন চল্লিশেক লোক থাকে এই মেস বাড়িটায়। বাড়িতো নয় একটা হাট, ঠেলাঠেলি ঠেসাঠেসি হৈ-চৈ-এর আর শেষ নেই। এই ভিড়ের মধ্যে প্রত্যেকেই যে যার নিজের কাজটুকু সারবার জন্যে ব্যস্ত। কমবয়সী ছোকরারা বাথরুমে একবার ঢুকলে আর বেরোতে চায় না। বাথরুম তো নয় জলসা-ঘর। সাবান ঘষবে আর সিনেমাসঙ্গীত চালাবে। অন্য কারো অফিসের সময়

রইল কি গেল সেদিকে কোন খেয়ালই নেই। অথচ মেস চলে সমবায় নীতিতে। ম্যানেজারের কাছে প্রত্যেকে সিট রেণ্ট, খোরাকি আর ষ্টাবলিশমেণ্ট চার্জের ভাগের ভাগ জমা দেয়। প্রত্যেকেরই এখানে সমান দায় সমান দাবি। মুখে কাউকে কাউকে যোগেশ্বর বলতে শুনেছেন, 'মেস তো নয় যেন একটি একান্নবর্তী পরিবার।' কিন্তু ওই নামেই একান্নবর্তী। একজনের সঙ্গে আর একজনের কেবল রেষারেষির সম্পর্ক। সামনে স্তুতি পিছনে নিন্দা। এই পঞ্চান্ন বছর বয়সে মানুষকে চিনতে আর বাকী নেই যোগেশ্বরের।

তেল মেখে কাপড় গামছা নিয়ে নিচে নামতে লাগলেন যোগেশ্বর। তেতলা থেকে দিনের মধ্যে চার পাঁচবার করে ওঠা-নামা করতে আজকাল বড় কষ্ট হয় যোগেশ্বরের। বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করতে থাকে। দোতলার তের নম্বরের বিশু আর শিবু প্রায়ই বলে 'এখনো আমাদের কথা শুনুন যোগেশদা। নিচে নেমে আসুন, ঘর বদলান। নইলে সিঁড়িতেই ন যযৌ ন তস্থৌ হয়ে কোনদিন দাঁড়িয়ে থাকবেন কেউ টেরও পাবে না।'

যোগেশ্বর বলেন, 'তাতে দুঃখ কি বিশু। আমার জন্যে তো কাঁদবার কেউ নেই।'

বিশু মল্লিক জবাব দেয়, 'আমরা অবশ্য আছি। কিন্তু আমাদের কান্নায় কি আর আপনার মন উঠবে। যার হাসিতে মুক্তা ঝরে কান্নায় পান্না তেমন একজনকে ঘরে নিয়ে আসুন। স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া হলে আমি তো প্রায়ই তাকে ভয় দেখাই আমি মরে গেলে কি করবে। বিধবা বিয়ে অবশ্য আজকাল দুটো চারটে হচ্ছে। কিন্তু তুমি তিন ছেলের মা। তোমার কোন উল্লাসের কারণ নেই।'

মেসের আর অফিসের কম বয়সী ছেলে-ছোকরারা যোগেশ্বরকে এখনো ঠাট্টা করে, 'বিয়ে করুন দাদা! এখনো সময় আছে বউদির মুখ দেখবার, মুখ দেখাবার।'

কিন্তু যোগেশ্বর জানেন ব্যাপারটা ঠাট্টাই। সত্যিই আর ওসবের সময় আর তাঁর নেই। স্বাস্থ্যও একেবারেই ভেঙে গেছে। কী করে

শরীর থাকবে। যা খান কিছুই হজম হয় না। পেটের রোগ লেগেই আছে বারমাস। এত ওষুধ এত পথ্য কিছুতেই কিছু হল না। রেগে গিয়ে এক একদিন কুপথ্য করে বসেন যোগেশ্বর। রেষ্টুরেণ্টে ঢুকে চপ-কাটলেট খেয়ে বসেন দু' একটা। তাতে ফল আরও খারাপ হয়। প্রকৃতি তাঁর এক ফোঁটা বিদ্রোহও আজকাল আর সহ্য করে না। কিন্তু আশ্চর্য সাহস জিতেন সরকারের। এই বয়সে একেবারে বাকি জীবনের জন্যে পার্মানেন্ট চপ-কাটলেটের ব্যবস্থা করে রাখল। বুঝবে মজা।

তেতলা থেকে নামতে থাকেন যোগেশ্বর। কয়েকটা সিঁড়ি বাদে মাঝে মাঝে একটু থেমে বিশ্রাম করে নেন। নইলে বড়কষ্ট হয়। দোতলা কি একতলার কারো সঙ্গে ঘর অবশ্য বদল করে নিতে পারেন যোগেশ্বর। কিন্তু তাঁর ঘরের মত সিঙ্গল সিটের রুম আর পাবেন কোথায়। যে ঘরে দু'জন থাকত সে ঘরে আজকাল চারজন থাকে। এত টানাটানি জায়গা নিয়ে। শুধু তাঁর চিলেকোঠারই কোন ভাগীদার হয়নি। ওঘরে আর কারও অংশ নেওয়া একান্তই অসম্ভব বলে। নইলে ওঘরেও তিনজনকে ঠাঁই দিতে হত। আজকাল আর লোকজনের হট্টগোল সহ্য হয় না যোগেশ্বরের। অল্পেই মেজাজ বিগড়ে যায়। একা একা বইটই কি দু একটা মাসিক সপ্তাহিক নিয়েই সময়টা বেশ কেটে যায়। কিন্তু এই মেসের হৈ-হল্লাতেও মাঝে মাঝে বড়ই বিরক্তি ধরে যোগেশ্বরের। এক একবার ভাবেন অন্য কোথাও চলে যাবেন। মেস বদলে লাভ নেই। সব মেসই সমান। বাসা একটা করলে হয়। একটু নিরিবিলিতে স্বাধীনভাবে থাকা যায়। কিন্তু শুধু চাকরবাকর নিয়ে বাসা করে লাভ কি। জিনিসপত্তর চুরি করে সরে পড়লেই হল। ছোট বউদি আসানসোলে আছেন মেয়ে জামাইয়ের কাছে। যখন ঝগড়া-ঝাঁটি হয়, কি টাকা-পয়সার টানাটানি পড়ে, চিঠি লেখেন 'প্রাণের ভাই ঠাকুরপো!' কিন্তু অন্য সময় যোগেশ্বরের কথা তাঁর মনেও পড়ে না। কিংবা পড়লেও এতখানি মনের জোর নেই নাতিনাতনীদের ফেলে যোগেশ্বরের সঙ্গে তিনি কলকাতায় আলাদা বাসা করতে পারেন।

যদিও করলে আর দোষ নেই। এখন সেই বউদির বয়সও ষাটের কাছাকাছি গেছে। যোগেশ্বরের নিজেরও আর ইচ্ছা করে না। কী হবে অনর্থক ঝামেলা বাড়িয়ে। বোনেদের মধ্যে মেজোটি এখনো বেঁচে আছে। সুবর্ণ বলে 'দাদা, যদি বাসা করতে মাঝে মাঝে এসে থাকতে পারতাম।' স্বামী সংসার ছেলেপুলে নাতি-নাতনী নিয়ে ভাগলপুরে ভালোই আছে সুবর্ণ। কিন্তু মাঝে মাঝে তার হাওয়া বদলাবার জন্যে কলকাতা সহরে সারা বছর বাড়ীভাড়া টানতে পারেন এমন সামর্থ কই যোগেশ্বরের। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব নেই। তিনি জানেন বাসা একখানা ভাড়া করলে গন্ধে গন্ধে কত আত্মীয় আসবে, কুটুম্ব আসবে। কিন্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্ হবার যোগেশ্বরের সাধ্য কোথায়। দেশী মার্চেন্ট অফিসের একাউন্টস্ ডিপার্টমেন্টের কেরাণী। কেটে-ছেঁটে পুরো দুশো টাকাও মাসের শেষে ঘরে আনতে পারেন না। অথচ আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব অনেকেরই ধারণা যোগেশ্বর দাস অনেক টাকার মালিক। যেন আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ তাঁর আছে। যেহেতু তিনি পান সিগারেট খান না, খেলাধুলা, সিনেমা থিয়েটার দেখেন না। তাই যেন তিনি সব খরচ থেকে একেবারে মুক্ত। আরে একটা লোকের খোরাক পোষাকের খরচ কি এই সহরে কম? তারপর ওঁষুধপথ্যের খরচ আছে। শুধু নিজের এই হাড় কখানা খাড়া করে রাখবার জন্যেই যোগেশ্বরের একশ' সোয়াশো টাকা বেরিয়ে যায়। বাকি কটা টাকাও ব্যাঙ্কে তুলে রাখবার জো নেই। ভাগ্নে ভাগ্নী ভাইপো ভাইঝি বন্ধুবান্ধব থাবা পেতেই আছে। কোন মাসে কে যে নখ বসাবে তার ঠিক নেই। যোগেশ্বর রাগ করেন, বকাবকি করেন, মুখ খিঁচিয়ে বলেন, 'কোন মহারাজা পেয়েছ আমাকে? কোত্থেকে দেব আমি? একটা ফুটো পয়সাও দিতে পারব না আমি।'

তবু দিতে হয়। যে দশ চায় তাকে পাঁচ, যে পাঁচ চায় দুটাকা দিলেও দিতে হয় তাকে। কিন্তু এতেও ঝামেলা কম নয়। ভাইঝিরা ভাবে যোগেশ্বর ভাগ্নীদের বেশি ভালোবাসেন। ভাগ্নীরা ভাবে ভাইঝিদের ওপরই তাঁর বেশি পক্ষপাত।

স্নানাহার সারতে বেশি সময় লাগে না যোগেশ্বরের। ছেলেবেলা থেকেই এসব কাজ চটপট করে ফেলা তার অভ্যাস। খেতে খেতে বেশি কথাবার্তা বলা তাঁর স্বভাব নয়। কিন্তু আসল কথা একেবারে না বলে পারলেন না। খেতে বসে পাশের ভদ্রলোককে বললেন, 'আরে শুনছেন গোবিন্দবাবু, আজ একটা মজার খবর আছে।'

গোবিন্দবাবু গরম মাছের ঝোল দিয়ে ভাত মাখতে মাখতে বললেন, 'কোন কাগজে বেরিয়েছে।'

যোগেশ্বর বললেন, 'কাগজে বেরোবার মত খবরই বটে। এখনো বেরোয়নি পরে বেরোবে। আরে আমাদের জিতেন সরকার এক সময় দেশের ছোট-খাট লীডারই ছিল। দশ বার বছর জেল খেটেছে। বক্তৃতা-টক্তৃতা কাগজে ছাপা হত। এক সঙ্গে হিজলী জেলে ছিলাম আমরা।'

গোবিন্দবাবুর ব্যাঙ্কের চাকরি। বেরোবার তাড়া বেশি। বড় বড় গ্রাস মুখে দিতে দিতে বললেন, 'ও।'

যোগেশ্বর এবার মজার খবরটা ফাঁস করে বললেন, 'আমাদের সেই জিতেন সরকারের আজ বিয়ে। সাহস দেখুন। পঞ্চাশ কবে পার হয়ে গেছে তার ঠিক নেই, আমার চেয়ে বড় জোর হু'এক বছরের জুনিয়র হবে। এই বয়সে সাহসটা দেখুন এবার—।'

গোবিন্দবাবু খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আজকাল তো এমন হচ্ছেই।' বলেই আঁচাবার জন্যে চলে গেলেন কলের কাছে।

যোগেশ্বর ভারি ক্ষুণ্ণ হলেন। মনে মনে বললেন, 'লোকটি জন্মবেরসিক। কোন রসকস নেই ভিতরে। এমন একটা খবর দিলাম কিন্তু হুঁ-ও না হাঁ-ও না। এই হাঁড়িমুখোর কাছে আমার কিছু বলতে যাওয়াই ভুল হয়েছে।'

অফিসে এসে খানিকটা আফসোস মিটল যোগেশ্বরের। নিমন্ত্রণের চিঠিখানা পকেটে নিয়ে এসেছিলেন। কাজকর্মের চাপ একটু কমলে সেখানা সহকর্মীদের পড়ে শোনালেন। জিতেন সরকারের পরিচয়,

তার সঙ্গে যোগেশ্বরের বন্ধুত্বের সূত্র, সব কাহিনী বর্ণনা করে বললেন, 'মেয়েদের সম্পর্কে একটু দুর্বলতা জিতেনের গোড়া থেকেই ছিল। ও যখন বলত জীবনে কোনদিন বিয়ে করবে না আমি মনে মনে হাসতাম। এক এক সময় মুখের ওপরই বলতাম, ভায়া এ প্রতিজ্ঞা রাখা তোমার কাজ নয়। মেয়ে ভলান্টিয়ার এলে তোমার যা চোখ মুখের ভঙ্গি হয় তাতে ভরসার বেশি কারণ দেখিনে।'

ক্যাশিয়ার প্রাণকুমার কাউন্টারের উপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে হেসে বলল, 'দাদা তো আজ বেশ ফর্মে আছেন দেখছি।'

যোগেশ্বর জবাব দিলেন, 'আমি চিরদিনই ফর্মে থাকি। গরীবেব কথা বাসি হলে মিষ্টি লাগে। জিতেন সেই বিয়ে করল কিন্তু পঞ্চাশ পার হয়ে যাওয়ার পর।'

প্রাণকুমার বলল, 'বেশ তো যোগেশদা। আপনিও তাই করুন। বন্ধুকে দেখে ইনসপায়ার্ড হয়ে পড়ুন। যাহা বাহান্ন তাহা তিপ্পান্ন।'

যোগেশ্বর বললেন, 'নারে ভাই, ওসব দিকে মতিগতি থাকলে আগেই করতাম। সুবিধা সুযোগ যে না এসেছিল তা নয়। কিন্তু নিজের প্রতিজ্ঞা থেকে একপাও টলিনি। মেয়েদের নিয়ে কত কাজকর্ম করেছি, কিন্তু কেউ বলতে পারবে না কারো সঙ্গে বাজে ঠাট্টা ইয়ারকি করেছি কি চালচলনে কোন অভদ্রতা ধরা পড়েছে। কক্ষনো না, কোন দিনই না। ধাতই অন্য রকম ছিল। আমাদের শিক্ষা-দীক্ষার ধরনই ছিল আলাদা।'

যোগেশ্বরের কথা অফিসে কেউ অবিশ্বাস করে না। সত্যিই মেয়েদের সম্বন্ধে তাঁর কোন রকম দুর্বলতা কেউ দেখেনি, কেউ শোনেওনি। যোগেশ্বরের চেয়েও বেশি বয়সী লোক এ অফিসে আছেন। আদিরসের প্রসঙ্গ উঠলে তাঁদের উচ্ছ্বলতার আর সীমা থাকে না। কিন্তু যোগেশ্বর তেমন মানুষ নন। বয়সের উপযোগী গম্ভীর্য গুরুত্ব তিনি রক্ষা করে চলেন, বরং মেয়েদের প্রসঙ্গ নিয়ে সহকর্মীরা বেশি মেতে উঠলে অস্বস্তি বোধ করেন। কম বয়সী ছেলে-ছোকরাদের দু'একটা ধমকটমকও যে না দেন তা নয়।

তবে এখনকার যুবকদের চালচলন আদর্শচ্যুতি নিয়ে যোগেশ্বর যখন খুব রাগ করেন, বিক্ষোভ জানান, তরুণ সহকর্মীদের সবাই তাঁকে ছেড়ে দেয় না। তারা বলে 'দাদা নিজের যৌবনটাকে একবার মনে করে দেখুন। সেকালেও আপনাদের বাপ-দাদারা বকতেন ছোঁড়াগুলি উচ্ছন্নে গেল। কিন্তু পৃথিবীটা উচ্ছন্নে যায় নি। একই ভাবে টিকে আছে।'

যোগেশ্বর প্রতিবাদ করে বলেন, 'আমাদের সঙ্গে তোমাদের তুলনা? যে কষ্ট আমরা করেছি, যে দুঃখ আমরা সয়েছি তার কতটুকু তোমাদের সহ্য করতে হয়? সহ্য করবার শক্তি রাখ তোমরা? আমরা স্বাধীনতার জন্যে বিদেশীদের সঙ্গে লড়েছি আর তোমরা পেয়েছ পড়ে পাওয়া জিনিস। এখনকার রাজনীতির কথা আর বল না। জেল নেই জরিমানা নেই শুধু এ্যাসেম্বলিতে দাঁড়িয়ে গরম গরম বক্তৃতা আর লম্বা লম্বা ষ্ট্যাটিসটিক্‌স্ দিতে পারলেই এখন নেতা হওয়া যায়। তখন নেতা হওয়া অত সহজ ছিল না। এমন কি সাধারণ একজন ভলান্টিয়ার কি ওয়ার্কারকেও অনেক অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়ে আসতে হত।'

যোগেশ্বর নিজের যৌবনকালকে সহকর্মীদের সামনে এত উজ্জ্বল করে তুলে ধরেন যে বিপক্ষদল তখনকার মত চুপ করতে বাধ্য হয়। কেউ বা শ্রদ্ধায় কেউ বা সহানুভূতিতে।

আজকের আলোচনাটা অবশ্য জিতেন সরকারের বিয়েকে কেন্দ্র করেই চলতে লাগল। কেউ বলল পঞ্চদশে বিয়ে করাটা বোকামি। এ বয়সে তরুণী বউ ঘরে আনা তো নয় চিরস্থায়ী ঈর্ষা আর সন্দেহকে ডেকে আনা। কেউ বলল কথাটা একেবারে বাজে। বুদ্ধিমান পুরুষেরা পঞ্চাশের পরে বনে যায় না, উপবনে ঢোকে। তারপর পুরুষের প্রজনন ক্ষমতা কত বয়স পর্যন্ত থাকে তাই নিয়ে গবেষণা চলল। কেউ বলল ষাট, কেউ বলল সত্তর। প্রাণকুমার বলল আশি বছরের বুড়োকেও সে ছেলের বাপ হতে দেখেছে।

এরপর উঠল উপহার দেওয়ার কথা।

মণিমোহন বলল, 'বন্ধুর বিয়েতে কি প্রেজেন্ট করবেন দাদা ? বেশ একটা জুতসই জিনিস দিন।'

কেউ বলল, শাড়ি, কেউ বলল, ফ্লাওয়ারভাস, কেউ বা ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে ঝিনুক বাটি দেওয়ার পরামর্শ দিল।

যোগেশ্বর কার পরামর্শ যে নিলেন ঠিক খুলে বললেন না। ছুটির পর অফিস থেকে বেরিয়ে কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ের ষ্টেশনারি দোকানটার সামনে এসে দাঁড়ালেন। কিন্তু মেয়েদের ভিড়ে ঢুকবার পথ পেলেন না। এত ধরনের মেয়েও আছে কলকাতা সহরে। কেউ কুমারী, কেউ বিবাহিতা, কারো পরনে জমকালো রঙের শাড়ি, কাউকে আটসাঁট সাদা খোলের সাড়িতেই চমৎকার মানিয়েছে। যোগেশ্বর দেখতে লাগলেন। যেন এক বিচিত্র শোভাপারাবারের কূলে এসে দাঁড়িয়েছেন। রঙের ঢেউ, হাসির ঢেউ, উল্লাসের ঢেউ উঠছে আর কূলে আছড়ে পড়ছে। যোগেশ্বর বুঝতে পারছেন শুধু জিতেনেরই বিয়ে নয় শহরের আরো অনেকে এই দিনটিকে জীবনের শুভদিন হিসাবে বেছে নিয়েছে। তাদেরই প্রীতি উপহারের আয়োজনে ভিড় জমেছে দোকানে দোকানে।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে সন্তর্পণে পাশ কাটিয়ে যোগেশ্বর কাউন্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, সঙ্গে সঙ্গে একটি সুদর্শন যুবক সেলসম্যান স্নিগ্ধমুখে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলল, 'কী দেব বলুন। প্রেজেন্টেসনের জিনিস চাইতো ?'

যোগেশ্বর বললেন, 'হ্যাঁ।'

'কত দামের মধ্যে দেব বলুন ?'

যোগেশ্বর একটু হিসাব করে বললেন, 'পাঁচ ছ টাকার ওপরে না যায়।'

মনে মনে ভাবলেন, বেশি খরচ করে লাভ কি। জিতেন তো তেমন সম্পর্ক আর রাখেনি। দু বছরের মধ্যে কোন দেখাসাক্ষাৎই নেই তার। দেখা করবেই বা কেন ? ইনসিওরেন্স অফিসের বড় অফিসার হয়েছে এখন। দুগুণ আড়াইগুণ বেশি মাইনে পায় আমার

চেয়ে। এখন আর আমাকে সে পাত্তা দেবে কেন। কিন্তু একদিন ছিল যখন অসুখে বিসুখে বিপদে আপদে—'

'কী নেবেন বলুন ?'

বিক্রেতা একরাশ জিনিস এনে কাউণ্টারের উপর তুলে দিয়েছে। টয়লেটের বাক্স, নকশা কাটা আয়নার বাক্স, ফুলদানি আরো সব কি কি—যোগেশ্বর নামও জানেন না। কিন্তু কিছুই ভালো লাগে না। যা ধরেন তাতেই মন খুঁৎ খুঁৎ করে। শুধু দামেই ভারি, নামেই ভারি, জিনিসটা হালকা।

যুবক সেলসম্যান যোগেশ্বরের খুঁৎখুঁতনি দেখে বিরক্ত হল না। হেসে বলল, 'তাহলে এইটে দেখুন।'

দেখে খুশি হলেন যোগেশ্বর। মূর্তিটা মন্দ নয় তো। হরগৌরীর যুগলরূপ। গৌরীর সঙ্গে আশ্লিষ্ট মহাদেব বৃদ্ধ নন, চির তরুণ। কোমল কামনীয় মুখের ডৌল সুঠাম গড়ন। গৌরীর মুখখানাও সুন্দর। লম্বাটে ছাঁদ। স্নিগ্ধ নমনীয়, শুধু যৌবনভারেই নয় আত্মোৎসর্গে আনতা।

যোগেশ্বর বললেন, 'বাঃ সুন্দর করেছে তো।'

সেলসম্যান বলল, 'কৃষ্ণনগরের তৈরী, মূর্তিটা ওরা ভালোই করে।'

যোগেশ্বর বললেন, 'কিন্তু জিনিসটা তো মাটির ; দুদিন বাদেই ভেঙে যাবে।'

সেলসম্যান হাসল, 'সে কথা যদি বলেন সংসারে সবাই তো ভঙ্গুর স্যার। যতক্ষণ না ভাঙে ততক্ষণ সুন্দর আর ভালো থাকলেই হল।'

কথাটা মনে ধরল যোগেশ্বরের। মূর্তিখানা অনেক আগেই মনে ধরেছে। দামও বেশি নয়। সাড়ে চার টাকার মধ্যেই হল।

প্যাকেটটা হাতে নিয়ে যোগেশ্বর খুশি মনেই দোকান থেকে বেরিয়ে এলেন। নবদম্পতীর কাছে শিবপার্বতীর চেয়ে যোগ্যতর আদর্শ আর কী হতে পারে।

মেসে ফিরে নিজের ঘরে জিনিসপত্র রেখে এসে সাবান নিয়ে বাথরুমে ঢুকলেন যোগেশ্বর। মাসে একদিন মাত্র তিনি সাবান

মাখেন। সেলুন থেকে চুল কেটে আসার দিন। সাধারণত একদিন অন্তর সেভ করেন যোগেশ্বর। একদিনেই দুগালে রূপালি দাগ চিক চিক করে। কিন্তু আজ কি মনে হল, সকালে সেভ করা সত্ত্বেও বিকালে আর একবার সেভ করে নিলেন। সাবান আর তোয়ালে নিয়ে ঢুকলেন বাথরুমে। সকালের মত ভিড় নেই, অনেকক্ষণ ধরে স্নান করলেন।

কিন্তু মুশকিল বাঁধাল জামা কাপড় নিয়ে। অফিসে যে ধুতি পাঞ্জাবির হাতায় অসাবধানে লাল কালির দাগ লেগেছে। এই জামাকাপড়ে বিয়ের নিমন্ত্রণ রাখা যায় না। স্যুটকেশ খুললেন ধোয়া ধুতি পাঞ্জাবি বের করে নেবেন বলে। কিন্তু যা দেখলেন তাতে চক্ষুস্থির হয়ে গেল। দুটি পাঞ্জাবির মধ্যে একটিও আস্ত ফিরে আসেনি। জামাগুলি অবশ্য পুরোন হয়েছিল। কিন্তু ধোপা যে সেগুলি এমন নিষ্ঠুর ভাবে আছড়ে শেষ করে দেবে তা ভাবতে পারেননি যোগেশ্বর। একেই বলে ভাগ্যের মার। খানিকক্ষণ গালে হাত দিয়ে বসে রইলেন তিনি। একবার ভাবলেন, 'দূর ছাই যাব না। নিজে এসে নিমন্ত্রণ করেনি। ডাকে চিঠি পাঠিয়েছে। তাও দুদিন আগে পাঠায়নি। এমন নিমন্ত্রণে না গেলে কোন দোষ হবে না।'

কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর মনে হল কাজটা ঠিক হচ্ছে না। পুরোন অনেক বন্ধুবান্ধব আসবে। যোগেশ্বর যদি না যান কথা হবে তাই নিয়ে। কেউ কেউ ভাববে তাঁকে নিমন্ত্রণই করা হয়নি, কেউ বা ভাববে যোগেশ্বর হিংসায় যেতে পারলেন না। যেমন করেই হোক তাঁকে যেতেই হবে। আস্ত জামা কারো কাছে ধার পান তো ভালো না পান তো ছেঁড়া জামা গায়েই যাবেন তিনি। উপায় কি। তাঁর ঘরে তো বউ নেই যে জামা কাপড় গুছিয়ে রাখবে। বউ এলেও আসতে পারত। বিয়ে করলেও করতে পারতেন যোগেশ্বর। কেন করেননি আজ সে কথা কেউ জিজ্ঞাসা করলে তার কোন স্পষ্ট জবাব দেওয়ার আর জো নেই। নিজের কাছেই সে উত্তর অত্যন্ত অস্পষ্ট হয়ে গেছে। কেন বিয়ে করেননি যোগেশ্বর? দেশের কাজে

জীবন উৎসর্গ করেছিলেন বলে? কিন্তু কিছুটা উদ্বৃত্ত অংশ ছোট একটি পরিবারকে কি দেওয়া যেত না? আজ মনে হয় যেত। জেলে যাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে একটি মেয়ের সঙ্গে আর এক ধরণের বন্ধনের স্বাদ নিতে পারতেন যোগেশ্বর। এমন কিছু বাধা হত না। অনেকেই নিয়েছে। কিন্তু সে কথা তখন মনে হয়নি। তার পরে সময় আর সুযোগ এসেছে। তখন কেন করেননি? গরীব ছিলেন বলে? কাজকর্মের কোন স্থিরতা ছিল না বলে? কিন্তু তাঁর চেয়ে দরিদ্র আর অস্থিরকর্মা কি বন্ধুদের মধ্যে নেই! তাঁরাও তো বিয়ে-থা করে সংসারী হয়েছে। তবে কি জন্য করেননি? রুগ্ন বলে? তাও নয়। কোন মেয়ের ভালোবাসা পাননি বলে? তাও নয়। বিয়ে করতে হলে ভালোবাসার দরকার হয় না। সবগুলি কারণে কিংবা বলা যায় অকারণেই বিয়ে করা হয়ে ওঠেনি তাঁর। আপন প্রশ্নের জবাব নিজের মন থেকেও হারিয়ে গেছে। স্যুটকেশটা বন্ধ করে জামার খোঁজে বেরোলেন যোগেশ্বর। মেসের সবাইর সঙ্গে তাঁর আলাপ-পরিচয় নেই। কিন্তু কারো কারো সঙ্গে তো আছে। যোগেশ্বর তাঁদের কাছে গিয়ে বললেন, 'একটি জামা দিতে পারবে আজ রাতটুকুর জন্যে?'

শৈলেন কর বলল, 'বাড়তি জামা কোথায় দাদা? একটি নিজের গায়ে, আর একটি ধোপা বাড়িতে। বড় লজ্জা দিলেন।'

বীরেন দত্ত তক্তপোষে বসে সঙ্গীদের নিয়ে তাস খেলছিল। তার কাছে সমস্যাটার কথা তুলতে সে হেসে বলল, 'আমার মত বেঁটে মানুষের জামা আপনার গায়ে ফতুয়া হয়ে যাবে যে যোগেশদা। মানাবে না যে।'

যত না না শোনেন তত জেদ বাড়ে যোগেশ্বরের। যেমন করেই হোক জামা একটা জোটাতেই হবে তাঁকে। টাকা যদি লাগে সেও ভালো। একতলার থেকে তিনতলা পর্যন্ত বার বার ওঠানামা করলেন যোগেশ্বর। যখন যার নাম মনে পড়ল তার ঘরে গিয়ে হাজির হলেন। কিন্তু কারো কাছেই যোগ্য জামা নেই।

শেষ পর্যন্ত সন্ধান মিলল একতলার ৩নং ঘরের ভবেশ মজুমদারের কাছে। সৌখীন মানুষ। কিছুদিন আগে প্রেম করে বিয়ে করেছে। মুখখানা হাসিখুসি,‥মনটা বেশ উদার।

ভবেশ সব কথা শুনে বলল, 'জামার অভাব কি! বিয়েতে যাবেন আপনি আমার গরদের জামাটা নিয়ে যান। ধোয়াই আছে।'

যোগেশ্বর বললেন, 'গরদের দরকার নেই ভাই। একটা ফর্সা লঙক্লথ পেলেই যথেষ্ট।'

ভবেশ বলল, 'না না, তা কি হয়। বিয়ে বাড়িতে যাচ্ছেন, একটু সেজেগুজে না গেলে বরাঙ্গনারা ফিরে তাকাবে কেন।'

কিছুতেই ছাড়ল না ভবেশ। যোগেশ্বরকে তার গরদের জামটা জোর করেই পরিয়ে দিল। ভবেশের তিনজন রুমমেটও যোগ দিল সঙ্গে। কেউ জামায় সেণ্ট মাখাল, কেউ পাউডারের পাফ বুলিয়ে দিল ঘাড়ে আর গলায়।

যোগেশ্বর আজ চটলেন না। তাঁকে নিয়ে যুবকদের এই কৌতুক স্মিতমুখে সহ্য করলেন।

ভবেশ বলল, 'যা মানিয়েছে দাদা, একবার দেখুন না আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে। 'পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি আপন গন্ধে মম।'

স্নেহাংশু একবার এ পাশ থেকে আর একবার ওপাশ থেকে যোগেশ্বরকে দেখে নিয়ে বলল, 'দাদা সাজখানা যা হয়েছে তাতে আর কিছু রক্ষা থাকবে না। আপনার বন্ধুর বউ তাঁর বরকে ছেড়ে বরযাত্রীর পিছু নেবেন।'

ভবেশ বলল, 'দাদা বুক আর পিঠ তো ঢাকল, এবার টাক ঢাকবেন কি করে! এক কালে তো কংগ্রেস-টংগ্রেস করেছেন। দু একটা টুপি নিশ্চয়ই খুঁজে পেতে পারেন। তাই পরে যান।'

যোগেশ্বর হেসে বললেন, 'তার দরকার নেই ভাই। বিধাতার মার যখন মাথায় এসে পড়েইছে তাকে শিরোধার্য করাই ভালো।'

উপহারের জিনিসটা ঘরেই রয়ে গেছে। মূর্তিটা আনবার জন্যে যোগেশ্বর আবার ওপরে উঠলেন। অতগুলি সিঁড়ি ভেঙে ঘরে

এসে পৌঁছবার পর ভারি ক্লান্তি লাগল। টিপ টিপ করছে বুক। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। ভয় হল যোগেশ্বরের। হার্টফেল করে বসবেন নাকি।

তক্তাপোষখানার ওপর জামা পরা অবস্থাতেই শুয়ে পড়লেন। পরের দামি জামাটা নষ্ট হচ্ছে এই মুহূর্তে সে কথা আর মনে পড়ল না।

আধঘণ্টা খানেক বাদে একটু সুস্থ বোধ করলেন যোগেশ্বর। উঠে বসলেন বিছানার ওপর। এবার আস্তে আস্তে বেরিয়ে পড়লে হয়।

কিন্তু কটা বাজল ? হাত ঘড়িটায় চোখ বুলালেন যোগেশ্বর। ইস দশটা বেজে গেছে। এখান থেকে টালিগঞ্জে যেতে আরো প্রায় ঘণ্টাখানেক লাগবে। না এত রাত্রে আর যাওয়া যায় না। গেলেও ফেরার সমস্যা আছে। যোগেশ্বর ইতস্তত করতে লাগলেন। বারবার মনে হল নিমন্ত্রণ রাখবার পক্ষে রাতটা বেয়াড়া রকমের বেড়ে পড়েছে। এখন গেলে অভদ্রতা হবে। তাঁরও কষ্টের শেষ।

নিজের ওপর রাগ হতে লাগল যোগেশ্বরের। এতদিন বাদে বন্ধুর কাছ থেকে যদি বা একটা বিয়ের নিমন্ত্রণ পেলেন কিছুতেই তা রাখতে পারলেন না। রাগ হল নিজের অন্যমনস্কতার ওপর। ভালো দু একটা জামা আগেই করিয়ে রাখা উচিত ছিল। জামা পুরোন হলে সামান্য আছাড়েই তা ছেঁড়ে একথা তাঁর আগে মনে হয়নি কেন। রাগ হল নিজের হীন স্বাস্থ্য আর বার্ধক্যের ওপর। রাগ হল প্রাকৃতিক নিয়মের ওপর। রোগ আর জ্বরটা যদি না থাকত তাহলে কী ক্ষতি হত দুনিয়ার !

যাওয়াই যখন হোল না জামাটা এবার ভবেশকে ফিরিয়ে দিয়ে আসতে হয়। নিতান্ত নৈরাশ্যে অসহায় ভাবে গরদের পাঞ্জাবির বোতামগুলি খুলতে লাগলেন যোগেশ্বর।

খুলতে খুলতে হঠাৎ টেবিলের উপরের সেই হরগৌরীর মূর্তি-খানির দিকে চোখ পড়ল। লোভ সামলাতে পারেন নি যোগেশ্বর। মূর্তিখানা আরো কয়েকবার দেখে নেবেন বলে কাগজের মোড়ক

খুলে টেবিলের উপরে সেখানাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন। দুপাশে দুটি ধূপকাঠি দিয়েছিলেন জ্বেলে। তা পুড়ে শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু গন্ধের রেশটুকু যেন যেয়েও যায়নি।

যোগেশ্বর আরো কিছুক্ষণ অপলকে সেই যুগলমূর্তির দিকে তাকিয়ে রইলেন তারপর একটু হেসে নিজের মনেই বললেন, 'জিনিসটা শেষ পর্যন্ত ঘরেই রয়ে গেল; মন্দ হল না ব্যাপারটা। নিজেকেই নিজে প্রেজেন্ট করে বসলাম।'

একটু বাদে নিঃশ্বাস ফেলে যোগেশ্বর আর একটি স্বগতোক্তি করলেন, 'কিন্তু আমি না করলে আর কেইবা করত?'

বিবাহ বার্ষিকী

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে জল্পনাকল্পনা অনেকদিন ধরেই চলছিল। বিকাশ আর নন্দা তাদের বিয়ের দশম বার্ষিক উৎসব এবার ঘটা করে যাপন করবে। গরজটা বিকাশের চেয়ে নন্দারই বেশি। নন্দার দাদা বউদি, দিদি জামাইবাবু সহপাঠিনী বান্ধবীরা সবাই কত নতুন নতুনভাবে তাদের বিয়ের দিনটিকে স্মরণ করে। কেউ কেউ স্ত্রীর জন্যে শাড়ি গয়না কিনে নিয়ে আসে, কেউ স্ত্রীকে নিয়ে সহরের বাইরে গিয়ে দিনটি কাটিয়ে আসে, গাড়ি থাকলে গাড়িতে যায়, না হলে ট্রেনে যায়, কেউ বাগানবাড়ি টাগানবাড়িতে গিয়ে পিকনিক করে, কেউ বা নিজের বাড়িতেই আত্মীয় স্বজনকে ডেকে খাওয়ায়। কতভাবে আমোদ-আহ্লাদ করে। ওসব দূরে থাকুক নন্দা এমন কপাল করে এসেছে যে এ্যানিভারসারির দিনে ভালো একখানা শাড়িও তার জোটেনা। প্রথম দু'চার বছর বিকাশ কবিতার বই আর ফুল নিয়ে আসত। ক বছর ধ'রে তাও গেছে। গতবার ছিল বিচ্ছুর অসুখ, তার আগের বার নন্দা নিজেই টাইফয়েডে পড়েছিল। বিবাহ বার্ষিকীর দিনে বন্ধু-বান্ধব ফুল কি ধূপকাঠি কিচ্ছু আসেনি, ডাক্তার আর ওষুধ পথ্যই এসেছে। তার আগের বার নন্দা ওই সময়টায় বাবার কাছে কৃষ্ণনগরে ছিল। তার ফলে বিকাশের আর কোন খরচ হয়নি। খামে একখানা চিঠি পাঠিয়ে দিয়েই স্মরণোৎসব শেষ করেছে।

বিকাশ হেসে বলে, 'দেখ ওসব বড় লোকের উৎসব বড়-লোককেই মানায়। গরীবের কি ঘোড়া-রোগ সাজে।' সর্বসাকুল্যে পাইতো আড়াই শো। তার মধ্যে বাড়িভাড়া দোকানপাঠ মাসকাবারি দুটি ছেলেমেয়ের খোরাক-পোষাক স্কুলের মাইনে,

ডিসপেনসারির ওষুধের বিল মিটিয়ে এ্যানিভারসারি ট্যানিভারসারির কথা কি আর মনে থাকে ? যদি বেঁচে-বর্তে থাকি, আর অবস্থাটা ততদিনে ভালো হয়ে যায় আমরা এক সেনটিনারি করব। বিবাহ শতবার্ষিকী। নামটা যেমন গালভরা হবে, উৎসবটাও তেমনি বেশ জমকালো করে করব।

নন্দা রাগ করে জবাব দেয়, 'কষ্ট করে তোমাকে এতদিন অপেক্ষা করতে হবে না। আমার যা স্বাস্থ্য তাতে ছ'চার বছরের মধ্যেই আমি তোমাকে রেহাই দিয়ে যেতে পারব। তখন ঘটা করে দ্বিতীয় পক্ষ কোরো।'

বিকাশ সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে গম্ভীরভাবে জবাব দেয়, 'অত তাড়াতাড়িই কি আর সে ব্যবস্থা করতে পারব ? তার আগে একটা তাজমহল তৈরীর ব্যয় আছে না ?

নন্দা রাগ করতে করতেও স্বামীর কথার ভঙ্গিতে হেসে ফেলে বলে, 'ঈস, আমার কী একজন শাজাহান রে।'

তারপর যথারীতি স্বামী স্ত্রীতে সন্ধি হয়ে গেল। বিকাশ বলল, 'আচ্ছা, তোমাকে এবার একখানা দামী শাড়ি কিনে দেব।'

নন্দা বলল, 'কী শাড়ি দেবে বেনারসী ?

বিকাশকে হঠাৎ থেমে যেতে দেখে নন্দা ফের হেসে ফেলল ? ভয় নেই গো, ভয় নেই। তোমার কাছে সত্যি সত্যি বেনারসীও চাইব না, সিল্ক জর্জেটও চাইব না। তাঁত দাও মিল দাও—যা তুমি হাত তুলে দেবে তাই আমার ঢের। তবে হাসিমুখে দিতে হবে কিন্তু। সব টাকা একখানা শাড়িতে ব্যয় করে বসব এমন বে-আক্কেল আমি নই।'

তারপর মাস ভরে নন্দার জল্পনা-কল্পনা চলে বিবাহ বার্ষিকীর জন্যে বরাদ্দ করা টাকাটা তারা আর কত সার্থক ভাবে ব্যয় করতে পারে। নন্দার একবার ইচ্ছা হয় শাড়ি ফুল বই টই কেনা ছাড়াও ছ'চারজন বন্ধু-বান্ধবকে ডেকে খাওয়ায়। গতবার ফাল্গুন মাসে বীথিকা ভবানীপুর থেকে তাদের ম্যারেজ এ্যানিভারসারিতে নিমন্ত্রণ

করেছিল। বিকাশ যায়নি, কিন্তু নন্দা না গিয়ে পারেনি। কবিতার বই আর রজনীগন্ধায় টাকা আড়াই খরচ করেছিল। বীথিকা খাইয়েছিল খুব। পোলাও মুরগীর মাংস দই মিষ্টি। অত না খাওয়াতে পারলেও বীথি আর পরেশবাবুকে একবার না বললে কি ভালো দেখায়? আর কিছু না হোক বন্ধুকে ডেকে যদি ডাল ভাত মাছের ঝোল খাওয়ানো যায় তাতেও শান্তি।

কিন্তু এমন স্বামীর হাতেই পড়েছে নন্দা—যার মনে কবিত্ব কল্পনা বলে কোন পদার্থ নেই। তার কেবল হিসাব আর হিসাব। মার্চেন্ট অফিসের একাউনটস্ ডিপার্টমেণ্টে আর যেন কেউ দুনিয়ায় কাজ করে না। তারা কি সবাই হিসাবের খাতাটা মনের মধ্যে গেঁথে নিয়ে আসে?

প্রীতিভোজের প্রস্তাবে বিকাশ বলে, 'খেতে বললে শুধু তো আর পরেশবাবু আর তাঁর স্ত্রীকে বললেই চলে না? আরো দু'চার জনকে বলতে হয়। সে এক বিয়ের খরচ। তোমার বাবা কি দ্বিতীয়বার সে খরচ বইতে রাজী হবেন?'

নন্দা রাগ করে বলে, 'দায় পড়েছে আমার বাবার। দরকার নেই তোমার কিচ্ছু করে, ফের যদি আমি এসব নিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলি তাহলে আমার ফিরিয়ে নাম রেখ।'

কিন্তু নতুন নামে ডাকবার সুযোগ স্বামীকে নিজেই করে দেয় নন্দা। পরদিনই আবার নতুন প্লান করে। ছেলে মেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে স্বামীর মশারির মধ্যে এসে বসে, 'আচ্ছা যাক, দরকার নেই এবার আর কাউকে বলে। আসছে বছর বলব। এবার আমরা দুজনে ফটো তুলব, সিনেমা দেখব। সকাল বেলাটা বিচ্ছু আর বিবলুকে কোন জায়গা থেকে বেড়িয়ে আনব। তারপর দোতলার মাসীমার কাছে ওদের রেখে আমরা কোথাও বেরিয়ে পড়ব। দুজনে এক সঙ্গে ঘুরে ঘুরে ফুল কিনব, ধূপকাঠি কিনব, কী বল?'

বিকাশ বলে, 'আচ্ছা।'

নন্দা বলে, 'তারপর রাত্রে ফিরে এসে কী করব বল দেখি।' বিকাশ বলে, 'খাওয়া দাওয়াটা সেদিন বেশ ভালোই হবে আশা করি। ভূরিভোজের পর সহজেই ঘুম পাবে। দশটা বাজতে না বাজতেই তুজনেই নাক ডাকতে থাকবে। বিয়ের দিন একটা সানাই বেজেছিল, এ্যানিভারসারির দিন তুটো সানাই বাজবে।'

নন্দা বলে, 'দেখ, ফের যদি ওসব কথা বল, আমি তোমার মুখ দেখব না! সেদিন রাত জেগে জেগে আমরা আমাদের সেই পুরোন চিঠিগুলি পড়ব। তখন কী সুন্দর সুন্দর চিঠিই না তুমি লিখতে। বারবার পড়লেও তা যেন আর ফুরোতে চাইত না। মাঝে মাঝে আবার কবিতা থাকত। কিছু রবীন্দ্রনাথের কিছু নিজের। তখনকার দিনের তোমার অনেক চিঠিই আমি যত্ন করে তুলে রেখেছি। কিন্তু আমার লেখা জবাবগুলির একটাও তোমার বাক্স সুটকেশে কোথাও খুঁজে পাইনি। আমার চিঠি তুমি রাখবে কেন। আমি তো আর ভালো লিখতে পারিনে। যারা পারত—তোমার সেই বান্ধবীদের চিঠি কিন্তু তু'চারখানা এখনো আছে।'

বিকাশ বলে, 'কী যে বল, আমার বান্ধবী টান্ধবী কেউ নেই। গৃহিণী বলতেও তুমি, সচিব বলতেও তুমি, সখি বলতেও তুমি।'

কথাটা একেবারে অসত্য নয়, ছেলেমেয়ে হয়ে যাওয়ার পর স্ত্রীজাতিরা অন্য কারো মুখ দেখা একেবারে বন্ধ না করলেও মন দেয়ানেয়ার পালা পুরোপুরিই শেষ করে ফেলেছে বিকাশ। বিশ্বাসহন্তার খড়্গ নন্দার ওপর যে পড়েনি সেজন্যে কৃতজ্ঞ। তার পরিচিত অনেককে এ তুঃখ ভোগ করতে হয়েছে।

বাদ প্রতিবাদের মধ্যে না গিয়ে নন্দা বলে, 'আমরা তাহলে রাত জেগে চিঠিগুলি পড়ব কী বল।'

বিকাশ আর আপত্তি করেনা। বিয়ের দশ বছর পরে তুটি ছেলে মেয়ের মা হওয়া সত্ত্বেও নন্দা যে এতখানি রোমান্টিক থেকে গেছে সে কথা জেনে বিকাশের বরং আনন্দই হয়, বিস্ময়ও নিতান্ত

কম হয়না। মনের এতখানি সজীবতা ও রাখতে পারল কী করে? নিশ্চয়ই স্বচ্ছল অবস্থার বান্ধবীদের কাছে সব গল্প শুনেছে, কি সৌখীন সমাজ নিয়ে লেখা নবেল টবেল পড়ে হাতের কাছে অন্য কোন পুরুষকে না পেয়ে বিবাহ বার্ষিকী উপলক্ষে স্বামীর সঙ্গেই আর একবার প্রেমে পড়বার, কি পড়িপড়ি ভাব করবার সাধ হয়েছে নন্দার। যাই হোক এ সাধ এবার আর বিকাশ অপূর্ণ রাখবেনা। পরিকল্পনা যে মঞ্জুর তা নন্দাকে সে জানিয়ে দিল।

ভোরবেলার চায়ের আসরেও এসব আলাপ আলোচনা হয়। ষোলই জ্যৈষ্ঠের আর বেশি দেরি নেই। আগে থেকেই তৈরী হতে হবে। নন্দা স্বামীকে অনুরোধ করে লাইফ-ইনসিওরের কোয়ার্টার্লি প্রিমিয়ামটা যেন এমাসে না দেয় বিকাশ। সামনের মাসে না হয় কিছু ফাইন দিয়েই তা দেওয়া যাবে।

বিকাশ বলে 'আচ্ছা আচ্ছা সেজন্যে তোমাকে ভাবতে হবেনা। ষোলই জ্যৈষ্ঠের অনুষ্ঠান ঠিক মতই হবে।'

বিচ্ছু আর বিবলু গম্ভীর হয়ে বাপমার আলোচনা শোনে।

আট বছরের ছেলে বিচ্ছু বলে, 'মা, ষোলই জ্যৈষ্ঠ কার জন্মদিন? তোমার?'

নন্দা বলে, 'দূর বোকা।'

'বাবার?'

নন্দা হেসে বলে, 'দূর তা নয়।'

বিচ্ছুর ছোট বোন ছ'বছরের বিবলু বলে, 'দাদাটা বোকা। কিচ্ছু জানেনা।'

বিকাশ হেসে বলে, 'তুই জানিস?'

বিবলু বলে, 'জানি। বিয়ের জন্মদিন। তোমাদের বিয়ের।'

বিকাশ হেসে উঠে স্ত্রীকে বলে দেখেছ নন্দা—তোমার মেয়ে এখনই কি রকম সেয়ানা হয়েছে দেখেছ? ওকে যদি আটবছরে গৌরী দান না করতে পারি নবম বছর থেকে পাড়ার ছোকরাদের ও মাথা খেতে শুরু করবে তোমাকে বলে রাখলাম।'

কলের কাছে কাজ করে নন্দার ঠিকে ঝি সুখলতা। বয়স পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ। হাতে শাঁখা, সিঁথিতে সিঁদুর। কপালের সীমান্ত পর্যন্ত ঘোমটা টানা থাকলেও সে কর্তা গিন্নী দুজনের সঙ্গেই কথা বলে। হাসিতামাসায় যোগ দেয়। বিকাশ আর নন্দা দুজনেই ওকে প্রশ্রয় দিয়েছে। কাজ করতে এসে সুখলতা চা খায়, দু চারটে সুখদুঃখের কথার বিনিময়ও যে না হয় তা নয়। সুখলতা বাসন মাজে, বাটনা বাটে, কয়লা ভাঙে, উনুনে আঁচ দিয়ে দেয়। মাসে আট টাকা করে নেয়। বাইরের কাজ করলেও বিকাশ আর নন্দার ঘরের খবর সে রাখে। কত টাকা মাইনের চাকরি করে বিকাশ, কটাকার কাঁচা বাজার করে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কোন দিন কোন ব্যাপার নিয়ে মনোমালিন্য হয় তা পর্যন্ত সে আন্দাজ করে।

বিকাশের কথা শুনে সেদিন বাসন মাজতে মাজতে সুখলতা বলল, 'ষোলই জ্যৈষ্ঠ খুব ভালো দিন না দাদাবাবু?'

বিকাশ বলল, 'কেন বলতো? ভালো দিন নিশ্চয়ই। ক্যালেণ্ডারের লাল তারিখ না হলে কি হবে, আমাদের পক্ষে রাঙা শুক্কুরবার।'

সুখলতা বিকাশের কথার ব্যঞ্জনা সবখানি না বুঝতে পারলেও হাসল, 'আমাদের বস্তীর চক্কোত্তি মশাইও তাই বললেন। তিনটে লগ্ন আছে ওইদিন। তারার বিয়ে ওইদিনই ঠিক করে ফেললাম বউদি।'

তারা সুখলতার বড় মেয়ে! পনের ষোল বছর বয়স হয়েছে। মাথায় এক গোছ কোঁকড়ানো চুল। রঙটা ফর্সা। মুখখানা একটি পানের মত। কথাবার্তা তত বলেনা। কিন্তু ভাবভঙ্গি দেখলে বোঝা যায় মার মতই বুদ্ধিসুদ্ধি রাখে।

এর আগে তারাকে মাঝে মাঝে সঙ্গে নিয়ে এসেছে সুখলতা। মেয়েকে দিয়ে নন্দার পান সাজিয়েছে, কি ময়দা মাখতে বসিয়েছে। তারবদলে চেয়েছে পুরোন শাড়ি ব্লাউজ। সময় সময় না চাইতেও দিয়েছে নন্দা। আহা বেচারা। না দিলে পাবে কোথায়?

নন্দা সুখলতার কথার জবাবে বলল, 'একেবারে ষোলই জ্যৈষ্ঠই ঠিক করে ফেললে? আমাদের কাছে একবার জিজ্ঞাসাও করলেনা?'

বিকাশ পরিহাসের সুরে বলল, 'কেন ভালোই তো হয়েছে নন্দা। আমাদের ফাংশনটা না হয় সুখলতার বাড়ি গিয়েই করা যাবে। তোমার মেয়ের বিয়েতে আমাকে নিমন্ত্রণ করবে তো সুখলতা?'

সুখলতা বলল, 'কী যে বলেন দাদাবাবু। আপনারাই তো মেয়ের বিয়ে দেবেন। আপনারা না দিলে আমার কি সাধ্য আছে ওই মেয়েকে নামানো? আমারও সাধ্য নেই, তারার বাপেরও সাধ্য নেই। বুড়ো নিত্যরোগা ঘর-ধরা হাঁপানির রোগী। আজ পাঁচ বছরের মধ্যে একটি পয়সা উপায় করেনি। সব আমাকে দেখতে হচ্ছে। আপনারা না দিলে আমি কোথায় পাব দাদাবাবু।'

বিকাশ কি বলবার আগে নন্দা বলে উঠল, 'তাইতো তোমাকে বলছিলাম সুখলতা। আমাদের সঙ্গে পরামর্শ না করেই মেয়ের বিয়ের তারিখ ঠিক করে ফেললে, এদিকে ওইদিন যে আমাদের একটা বাড়তি খরচ আছে।'

সুখলতা বলল, 'তা জানি বউদি। সেই বাড়তি খরচের মধ্যে দয়া করে একটু হাত ঝাড়বেন তাহলেই আমার হ'য়ে যাবে। পুরুত ঠাকুর বললেন দিনটা খুব ভালো। এদিকে পাত্রপক্ষেরও বেশ গরজ। মেয়ে খুব পছন্দ হয়ে গেছে। তাই আর দেরি করলাম না বউদি।'

সুখলতার মেয়ের বিয়ে আর নন্দার বিবাহ-বার্ষিকীর দিন একই সঙ্গে এগিয়ে আসতে লাগল। তোড়জোড় কোন পক্ষেরই কম নয়। নন্দা মনে মনে ঠিক করল, এদিনের সব খরচটা স্বামীর ঘাড়ে ফেলবে না। কাগজ বিক্রী করা টাকা যা সঞ্চয় করেছে তা তো নন্দার নিজেরই সম্পত্তি। তা এই উপলক্ষে ব্যয় করবে। গোপনে

গোপনে আরো পাঁচ সাত টাকা যা জমিয়েছে তাও এই দিনের কল্যাণে ভাঙলে দোষ নেই।

কিন্তু সুখলতা ভারি অবুঝ মেয়েমানুষ। তার দাবিদাওয়ার যেন আর শেষ নেই! সে বাটনা বাটতে বাটতে এক মুখ হেসে বলল, 'বউদি' তারাকে কী দেবেন বলুন।'

নন্দা চুপ করে রইল।

সুখলতা বলল, 'তারাকে কিন্তু একখানা জিনিস দিতে হবে। হাতের হোক কানের হোক একখানা জিনিস আপনারা দেবেন। সারাজীবন আপনাদের দয়া মনে করে রাখব বউদি।'

নন্দা বলল, 'অসম্ভব। এমাসে আমি কিছুই খরচ করতে পারব না তা তোমাকে আগেই বলে দিয়েছি। এ মাসে আমার নিজেরই খরচের সীমা নেই।'

সুখলতা তখন বলতে আরম্ভ করল, 'ঘোষালরা কিন্তু কানের ফুল দিয়েছে বউদি।'

নন্দা বিরক্ত হয়ে বলল, 'তা দিক গিয়ে। যার যা সাধ্য সে তাই তো দেবে। আমার নেই কোত্থেকে দেব।'

শুধু ঘোষালরা নয়, দত্তরা মুখুয্যেরা চৌধুরীরা সবাই দামী দামী জিনিস দিয়েছে কি দিতে চেয়েছে সুখলতাকে। কেউ চুড়ি, কেউ ফুল, কেউ সিলকের শাড়ি, কেউ বা বাসন কোসন। এদের কোন কোন বাড়িতে নতুন কাজ নিয়েছে সুখলতা। কোন বাড়িতে কাজ খুবই সামান্য। শুধু স্বামী স্ত্রীর দুখানা বাসন মেজে দেওয়া, তা সত্ত্বেও সুখলতার কন্যাদায়ে তাঁরা যথেষ্ট সাহায্য করছেন। নন্দারা পুরোন মনিব হয়ে যদি এমন বিমুখ হয় তাহলে সুখলতার মত গরীবরা দাঁড়ায় কোথায়।

কিন্তু নন্দা কিছুতেই বেশি প্রতিশ্রুতি দিল না। সে বলল, 'পুরোন শাড়ি ব্লাউস তুমি কম নাওনি আমার কাছ থেকে। তারপর ধার বলেই হোক, আর বকশিস বলেই হোক—ফি বছরে বিশ পঁচিশ টাকা করে বেশি নিচ্ছ। তোমার মেয়ের বিয়েতে

আলতা আর তেল সাবানের খরচ বাবদ পাঁচটা টাকা আমি ধরে দিতে পারি, তার বেশি এ মাসে কিছুতেই দিতে পারব না।'

সুখলতা বলল, 'তাহলে আপনি ধানদুর্বা দিয়েই তারাকে আশীর্বাদ করবেন বউদি। আর কিছু আপনার কাছে চাইব না।'

স্পর্ধা দেখ ঝি চাকরের! নন্দা ভাবল তখনই ওকে বিদায় করে দেয়। কিন্তু ঠিকে ঝি সুলভ নয়। তাই মনের রাগ মনেই চেপে রাখতে হল।

বিকাশ স্ত্রীকে আড়ালে ডেকে বলল, 'এক কাজ করো না। ভাঙাচোরা সোনা যদি কোথাও থাকে ওকে বের করে দাও, যা হোক কিছু একটা তৈরি করিয়ে নেবে।'

নন্দা বলল, 'থাকলে তো দেব। বিয়ের পর কত গয়না-গাঁটি তুমি আমাকে গড়িয়ে দিয়েছ। জানা আছে মুরোদ। বলে একখানা শাড়ি কিনে দিতে বললে প্রাণ ফেটে যায়।'

বিকাশ আর কথা না বাড়িয়ে অফিসে চলে গেল।

সুখলতা অবশ্য ধানদুর্বার ভরসায় রইল না। নন্দার কাছ থেকে পাঁচ টাকাই হাত পেতে নিল। বিকাশ নিজের পকেট খরচ থেকে গুনে আরো পাঁচ টাকা দিল সুখলতাকে। কিন্তু তাতেও কি ওর মন ওঠে? মুখে কিন্তু খুবই ভদ্রতা করল সুখলতা। মিষ্টি হেসে বলল, 'যাবেন কিন্তু দাদাবাবু। ছেলে-মেয়েদের নিয়ে একবার গিয়ে পায়ের ধুলো দিয়ে আসবেন বউদি। আশীর্বাদ করে আসবেন তারাকে। দেশে থাকলে আরও কত আমোদ-আহ্লাদ ব্যয়ভূষণ করে বিয়ে দিতাম বউদি। কিন্তু সে কপাল তো ওর নয়।'

নন্দা বলল, 'যাক গিয়ে জামাইটি তো ভালোই পেয়েছ।'

সুখলতা বলল, 'হ্যাঁ বউদি, আপনাদের আশীর্বাদে ছেলেটি ভালো। বেলেঘাটায় নিজেরই সেলুন আছে। দু-তিনজন লোক তাতে খাটে। ভালো অবস্থা। মেয়েটাকে দেখে শুনে পছন্দ করেছে তাই। নইলে ও সম্বন্ধ কি আমরা করতে পারি?'

নন্দা ভাবল বিয়ের দিন একবার গিয়ে আশীর্বাদ করে আসবে। অত করে বলছে যখন। পাড়ার মধ্যেই ওদের বস্তি। তাদের সিমলাইপাড়া লেন থেকে মাত্র মিনিট কয়েকের পথ।

তবু যাই যাই করে যাওয়া হল না। সময়ই করে উঠতে পারল না নন্দা। সকাল থেকেই কাজ। কাল রাত্রে গিয়ে দোতলার মাসীমা মেসমশাইকে খেতে বলে এসেছে। এই প্রৌঢ় দম্পতি তাদের দেখা শোনা করেন, খোঁজখবর নেন, ছেলেমেয়ে হুইটিকে ওদের কাছে রেখে নন্দা কোনদিন মার্কেটিংএ যায়, কোনদিন বা সিনেমায়। পুরোন বান্ধবীদের সঙ্গেও দেখা-সাক্ষাতের ইচ্ছা হয় কোন কোন সময়। কোন একটা উপলক্ষে ওদের না বললে কি চলে?

আর হুজন বাইরের লোককে খেতে বললেই তার জন্যে আলাদা বাজার করতে হয়, রান্না-বান্নার একটু বিশেষ ব্যবস্থা না করলে ভালো দেখায় না। ওদের আবার বেলায় খাওয়ার অভ্যাস। সব কাজ সারতে সারতে হুটো আড়াইটে বেজে গেল।

এদিকে বিচ্ছু আর বিবলু ভারি হুষ্টু হয়েছে। তারা বলে বেড়াচ্ছে, 'জানিস, আজ আমাদের বাবা মার বিয়ে।'

মাসীমা বলছেন, 'তাই নাকি বিচ্ছু? সম্প্রদান করবে তুমি বুঝি? তুমি তোমার মায়ের বাবা—না বাবার বাবা?'

বিচ্ছুও কম চালাক নয়, সে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিচ্ছে, 'আমি মারও বাবা, বাবারও বাবা। আমাকে মাও বাবা বলে, বাবাও বাবা বলে।'

কী হুষ্টুই হয়েছে ছেলে!

বেলা গেলেও এইটুকু ভেবে নন্দার তৃপ্তি যে এমন দিনে অন্তত একটি সুখী দম্পতিকে এই উপলক্ষে আপ্যায়ন করে আজ তাঁদের আশীর্বাদ নিতে পেরেছে। বাপ-মা দূরে থাকেন। তাঁদের তো বলতে পারল না। কিন্তু তাঁদের বয়সী হুজনকে বলল।

অনেক বলা-কওয়ার পর বিকাশ সত্যিই সেদিন অফিস থেকে ছুটি নিয়েছে। বাজার করেছে, ছেলে-মেয়ে হুটিকে নিয়ে প্রতিবেশী-দের বাড়ি থেকে বেড়িয়ে এসেছে। ওদের টফি আর চকোলেট

কিনে দিয়েছে। সবই অবশ্য নন্দার বুদ্ধি, তারই পরামর্শ। বিকেলে বাপ-মাকে এক সঙ্গে বেরোতে দেখে ওদের যাতে হিংসা না হয় সেই জন্যেই এই সব ব্যবস্থা।

তবু গোলমাল যেটুকু হবার তা হলই। নন্দাকে সেজে-গুজে বিকাশের সঙ্গে বেরোতে দেখে বিচ্ছু আর বিবলু দুজনেই বায়না ধরল তারাও যাবে।

বিকাশ পরিহাস করে বলল, 'ক্ষতি কি, ওরাও বরযাত্রী হিসেবে আসুক না সঙ্গে।'

নন্দা বলল 'তোমার কেবল ঠাট্টা। ব্যাপারটাকে তুমি মোটেই সিরিয়াসলি নিচ্ছ না।'

ভুলিয়ে টুলিয়ে বিচ্ছু ও বিবলুকে মাসিমার কাছেই গছিয়ে রেখে গেল নন্দা। আজ তার ওদের নিয়ে বেরো-বার মোটেই ইচ্ছা নেই। আজ কয়েক ঘণ্টার জন্যে সে শুধু প্রিয়া। জননীও নয়, গৃহিণীও নয়। কিন্তু বেশি দূর বেড়ানো হল না। মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত, বিকাশের দৌড় শ্যামবাজার। নড়তে চড়তে, তার ভালো লাগে না। ছুটির দিনে আয়েস করে শুয়ে বসে ঘুমিয়েই সে তৃপ্তি পায়। আলস্যের চেয়ে সংসারে বড় উপভোগ্য তার কাছে যেন আর কিছু নেই।

তবু অনেক আশ্চর্য কাণ্ড করল বিকাশ। রেষ্টুরেণ্টের পর্দা ঢাকা কেবিনে বসে স্ত্রীকে নিয়ে চা আর ফাউল কাটলেট খেল। ছোট একটা ষ্টুড়িয়োতে ঢুকে যুগল ফটো তুলল—যাতে বিকাশের চিরদিনের আপত্তি। নাইটশোয়ের সিনেমার টিকিট কিনল দু'খানা। কাপড়ের দোকানে ঢুকে পঁয়ত্রিশ টাকা দামের সিল্কের শাড়ি কিনে বসল। অবাক কাণ্ড!

নন্দা লজ্জিত হয়ে বলল, 'এ কী করলে বলতো। শাড়ির জন্যে আঠের টাকার বেশি তো বরাদ্দ ছিল না।'

বিকাশ বলল, 'বরাদ্দ কথাটা বড় বেশি গদ্য ঘেঁসা। আধুনিক কবিতাতেও ওর ব্যবহার নেই। শাড়িটা তোমার পছন্দ হয়েছে কিনা তাই বল। পাড় জমিন—'

নন্দা খুসি হয়ে বলল, 'তুইই চমৎকার! আমার পছন্দের চেয়ে তোমার পছন্দ ঢের বেশি ভালো। কিন্তু খরচে কুলোবে কী করে। এত টাকা পেলেই বা কোথায়?'

বিকাশ বলল, 'সেজন্যে ভেবোনা। কারো তবিল তছরুপ করিনি, সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।

নন্দা বলল, 'কিন্তু আমি তো তোমাকে কিছু দিলাম না।'

বিকাশ আবৃত্তির সুরে বলল, 'গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়। তোমরা তো নেওয়ার ভিতর দিয়েই দাও।'

তবু চার আনা দিয়ে একটি বেল ফুলের মালা কিনে নিল নন্দা।

তারপর ওরা বাড়ি ফিরল। ছেলেমেয়েদের খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে মাসিমাকে পাহারায় রেখে ওরা নটার শোয়ে সিনেমা দেখতে যাবে। টিকিট তো কাটাই আছে। দশ বার মিনিট দেরি হলেও কিছু এসে যাবে না।

বাসায় পৌঁছে নিজের শোবার ঘরে এসে মালা গাছটি স্বামীর গলায় পরিয়ে দিতে যাচ্ছিল নন্দা, বিকাশ বাধা দিয়ে বলল, 'এখন না পরে। আজ তো একই সঙ্গে বিয়ে বাসি বিয়ে আর ফুল শয্যা। ফিরে এসে ধীরে সুস্থে সব সারব। এবার ছেলেমেয়েদের ভোজন পর্বটা আগে সেরে ফেল।

তাই সারল নন্দা। খাওয়াবার পর ওদের ঘুমোবার ব্যবস্থা করল। মাসীমাকে আর একবার অনুরোধ করল ওদের দিকে চোখ রাখতে। তারপর সিনেমায় যাওয়ার জন্যে নতুন শাড়িটি পরতে যাচ্ছে দরজার কড়া নড়ে উঠল।

'কে?'

'আমি মনোমোহন।'

সুখলতার সেই বুড়ো স্বামী হাঁপানীর রোগী মনোমোহন হাঁপাতে হাঁপাতে এসেছে।

এর আগেও দুএকবার টাকা চাইতে, কি স্ত্রীর কাজ কামাইয়ের কৈফিয়ৎ দিতে এবাড়িতে এসেছে মনোমোহন। বিকাশ ওকে

চেনে। কুঁজো, কুদর্শন চেহারা। একবার দেখলে আর ভোলা যায়না।

বিকাশ দোরের কাছে দাঁড়িয়ে বলল, 'কী ব্যাপার। তোমার মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে ?'

'না বাবু।'

'কেন বর আসেনি ?'

মনোমোহন সব খুলে বলল। বর এসেছে। তবু সমস্যা মেটেনি। কারণ বিভ্রাট বর নিয়ে নয়, শাড়ি নিয়ে। লাল রঙের যে দামী শাড়িখানা সুখলতার পিস-তুতো ভাই অমূল্যধনের দেওয়ার কথা তার পাত্তা পাওয়া যাচ্ছেনা। সে পালিয়েছে। এইরাত্রে চেৎলা থেকে তাকে আর খুঁজে আনা সম্ভব নয়। এদিকে দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে গেছে ? বাড়তি টাকাই বা কোথায়। ভালো শাড়ির অভাবে বিয়েই বন্ধ হতে বসেছে।'

বিকাশ বলল, 'নতুন লালপেড়ে যে কোন একখানা শাড়ি পরিয়ে বিয়ে দিয়ে দাও।'

মনোমোহন কাতরভাবে বলল, 'তা দেওয়ার উপায় নেই বাবু। বরের কাকা বড় সেয়ানা। সে ঘটিবাটি শুদ্ধু সব জিনিস মিলিয়ে নিচ্ছে। একচুল এদিক ওদিক হলেও ভাইপোর বিয়ে দেবেনা। আমার জান যাবে বাবু। একখানা নতুন কাপড় আমাকে দিতেই হবে।'

বিকাশ ফিরে এল ঘরে। স্ত্রীর কাছে এসে বলল, 'কী ব্যবস্থা করা যায় বল দেখি। শুনেছ তো সবই।'

নন্দা বলল, 'শুনেছি। কিন্তু এক বর্ণও বিশ্বাস করিনি। সুখলতা জানে আজ আমার শাড়ি আসবে। তাই ছলেবলে সেখানা আদায় করে নিতে এসেছে। ওরা ঠিক-জোচ্চোর বদমাস। আমি ওদের একবিন্দুও বিশ্বাস করেনি।'

বিকাশ স্ত্রীর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'ছিঃ নন্দা।

মানুষকে অত ছোট ভেবনা। তাতে নিজেই ছোট হয়ে যাবে। শাড়ির অভাবে একটি গরীবের মেয়ের বিয়ে হচ্ছেনা, আর তুমি বুড়ো

বয়সে জমকালো শাড়ি পরে সোহাগ করছ, আর ওদের গালাগাল দিচ্ছ, মজা মন্দ নয়।'

নন্দা চীৎকার উঠল, 'চুপ, চুপ কর। তোমার দরদ যে কী জন্যে তা আর আমার টের পেতে বাকি নেই। আমি বুড়ী? তুমি তো চিরযৌবনের দখলী স্বত্ব নিয়ে এসেছ, যাও তাই ভোগ কর গিয়ে। আমার কাছে আর তোমায় আসতে হবেনা।'

স্বামীর পাশ কাটিয়ে হাত এড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল নন্দা। তারপর মনোমোহনের হাতে নতুন কেনা সিল্কের শাড়িখানি নিঃশব্দে তুলে দিল।

বিস্মিত মনোমোহন কী যেন বলতে যাচ্ছিল। নন্দা তাকে ধমক দিয়ে বলল 'যাও, এক্ষুণি চলে যাও। আর কথা নয়।'

প্রায় শেষ রাত অবধি ঝগড়াঝাটি কান্নাকাঠির পালা চলল। নন্দা বারবার বলতে লাগল, বিকাশের মত স্বামীর হাতে পড়ে জীবনে একদিনের জন্যেও সে সুখী হয়নি। চিরকাল তার দুঃখে দুঃখে গেল।, যতদিন যত রকমের দুর্ব্যবহার তার সঙ্গে করেছে বিকাশ, নন্দা তার ফিরিস্তি দিতে লাগল।

বিকাশ বিদ্রূপ করে বলল, 'তোমার যেমন স্মৃতিশক্তি তেমনি কল্পনা শক্তি।'

শেষরাত্রে প্রায় ভোর ভোর সময় স্ত্রীর ঘুমন্ত বিষণ্ণ মুখখানির দিকে চেয়ে বিকাশের বড় মায়া হল। ভিজে চোখ দুটিতে চুম্বন করল। ঠোঁট দুটি ভিজিয়ে দিল চুম্বনে চুম্বনে।

নন্দা চমকে জেগে উঠল। তারপর গভীর অভিমানে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে করতে বলল, 'আমাকে ছেড়ে দাও। আমি ছোট, আমি হীন, আমি তোমার যোগ্য নই।'

কিন্তু বিকাশ কিছুতেই স্ত্রীকে ছেড়ে দিল না। জোর করে ধরে রাখল। তারপর এধরণের দাম্পত্য কলহের ফল যা হয় সেই বাঞ্ছিত পরিণতি হল। মিল হয়ে গেল দুজনের।

নন্দা স্বামীর বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে বলল, 'একটা কথা বলব, বল রাখবে?'

বিকাশ বলল, 'বল।'

নন্দা বলল, 'কাউকে যেন বলনা, আমি শাড়িখানা ওদের রাগ করে দিয়েছি।'

বিকাশ স্ত্রীকে আরও কাছে টেনে নিয়ে অতি অনায়াসে একটি মধুর মিথ্যা উচ্চারণ করল, 'বাঃ রাগ করে দিতে যাবে কেন? তুমি ইচ্ছা করে দিয়েছ, খুসি হয়ে দিয়েছ। নাহলে কি আর দিতে?'

আঠারো আনা

স্বামী অফিসে বেরোবার সময় মীনাক্ষী আজও একবার কথাটা তুলল, 'কই তোমার বদলি-টদলির কি হল ?'

চিন্ময় শার্টের বোতামগুলি এঁটে স্ত্রীর হাত থেকে পানটা নিয়ে জবাব দিল, 'কই আর হল, সবই কর্তাদের মর্জি।'

চিন্ময় প্রসঙ্গটাকে আর বাড়তে না দিয়ে দোরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, মীনাক্ষী তাকে বাধা দিয়ে বলল, 'বা রে কথাটা শেষ হতে না হতেই তুমি চলে যাচ্ছ যে!'

চিন্ময় উদাসীনভাবে জবাব দিল, 'আঃ, কথা বলবার সময় তো আর ফুরিয়ে যাচ্ছে না। অফিস থেকে ফিরে এসে রাত এগারটা পর্যন্ত অনেক কথা শুনতে পারব, আমাকে ছেড়ে দাও। আমার অফিসের বেলা হয়ে যাচ্ছে।'

মাঝে মাঝে মীনাক্ষীরও বড় জেদ চাপে। সে অত সহজে স্বামীকে ছেড়ে দিল না। ঘর পার হয়ে তার পিছনে পিছনে বারান্দায় এসে বলল, 'শুধু কর্তাদের মর্জির দোহাই দিচ্ছ কেন। তুমি নিজেও তো কোন চেষ্টা-চরিত্র করছ না। এই তো গত জানুয়ারী মাসে নিত্যবাবু কেমন বদলি হয়ে কলকাতায় চলে গেছেন। আরো কতজনে যাচ্ছে। শুধু তোমারই কিছু হল না।'

চিন্ময় নির্বিকার দার্শনিকের ভঙ্গিতে বলল, 'সবারই কি সব জিনিস হয়? কিন্তু আজ আবার তোমার মনে সে আক্ষেপ দেখা দিল কেন? কাল রাত্রে সুনীল দত্তর প্রোগ্রাম শুনে?'

মীনাক্ষী স্বামীর দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে বলল, 'দেখ, তুমি যতই অপমান কর, কিছুতেই আমাকে কর্তব্য থেকে নিরস্ত করতে পারবেনা। আমি যা বলবার তা বলবই, আমি যা করবার তা

করবই, আমি যা চাইবার তা চাইবই। আর আমি তো অন্যায় কিছু চাইনে। আমি তোমার নাম চাই, যশ চাই। তুমি শুধু অডিট-অফিসের একজন অখ্যাত কেরানী হয়ে সারাজীবন কাটিয়ে দেবে আমি তা কিছুতেই হতে দেবনা।'

চিন্ময় বলল, 'বেশ তো দিয়োনা। এখনকার মত আমাকে যেতে দাও।'

বলতে বলতে চিন্ময় বাইরে নেমে পড়ল এবং সাইকেলটায় চেপে কয়েক মিনিটের মধ্যেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

সাইকেলটাকে দুচক্ষে দেখতে পারেনা মীনাক্ষী। অথচ এই নতুন-গড়ে-ওটা ছোট শহরে সাইকেল ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন যানবাহন নেই। বড় বড় অফিসারদের গাড়ি আছে। লোহা-লক্কড় বোঝাই ট্রাক আর লরি বিশ্রী শব্দ করতে করতে ব্রীজ এরিয়ায় যায়। কিন্তু মাথা খুঁড়লেও কলকাতা শহরের একটি ট্রাম কি বাস দেখতে পাবেনা মীনাক্ষী। তা না হয় না পেত, সাপের মত কিলবিল করতে করতে চলা এই সাইকেলগুলিকে যদি না দেখতে হত, তাহলে মীনাক্ষী বেঁচে যেত। কিন্তু সাইকেল এখানে থাকবেই। এই দু'চাকার গাড়ি এখানকার কেরানীবাবুদের একমাত্র ভরসা।

পিচের কালো রাস্তাটা সামনে বাঁধের দিকে এগিয়ে গেছে। আশে পাশে ছোট একতলা বাড়ি। সবগুলির নামই কোয়ার্টারস। কোন বাড়ির আলাদা কোন নাম নেই, আলিপুরে মীনাক্ষীদের যেমন ছিল। নিজেদের বাড়ি নয়, ভাড়াটে বাড়ি। কিন্তু 'নিরিবিলি' নামটা তাদেরই হয়ে গিয়েছিল। এসব বাড়ির নামও নেই, গোত্রও নেই, তবে টাইপ আলাদা আলাদা আছে। এ-বি-সি-ডি। বাড়ির চেহারা দেখলে চেনা যায় এই সেতুবন্ধনের কাজে কারা রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীব মহাবীরের জাত, আর কারাই বা সামান্য কাঠবিড়ালী। এঞ্জিনিয়ার, ওভারসিয়ার, সুপারভাইজার, কত রকমের কত পোস্টই যে আছে। মীনাক্ষীর স্বামী চিন্ময় ওসব কিছু নয়, সে শুধু সরকারী অফিসের একজন সাধারণ কেরানী। কিন্তু স্বামী বেশি মাইনের বড় একজন

ইঞ্জিনিয়ার হলনা বলে আক্ষেপ নেই মীনাক্ষীর, তার দুঃখ চিন্ময় যা ছিল তা রইলনা বলে, যে ঐশ্বর্য তার ছিল, তা সে হেলায় হারাল বলে।

উনুনে একটা তরকারি পুড়ে যাচ্ছে। দরজা বন্ধ করে ফের এসে রান্নাঘরে ঢুকল মীনাক্ষী। কিছুক্ষণের মধ্যে রান্নাটা শেষ করে মীনাক্ষী ফিরে এল শোবার ঘরে। এখনো অনেক কাজ বাকি। ভেবেছিল জানলার পর্দাগুলি খুলে কেচে দেবে। সেলফের বইগুলি এলোমেলো হয়ে আছে গুছিয়ে রাখলে হয়। কাজ করতে চাইলে কি কাজের অভাব? কিন্তু আজ আর ইচ্ছা করছে না কোন কাজে হাত দিতে। কার জন্যে কাজ করবে? চিন্ময়ের জন্যে? তার কি আর সংসারে মন আছে? সে কি আর মীনাক্ষীর হাতের কোন কাজ সত্যি সত্যি পছন্দ করে? সে কি আর মীনাক্ষীকে আগের মত ভালবাসে? তা যদি বাসত, তাহলে চিন্ময় তার সব কথা শুনত, নিজেকে এমন করে নষ্ট হতে দিতনা। যে সেতারের জন্যে তারা দু'জন আজ এক সঙ্গে মিলেছে, পরস্পরকে ভালবেসেছে, বিয়ে করেছে, যে সেতার তাদের মিলনের মাধ্যম, তাকে এমন করে অনাদর করতনা চিন্ময়। মীনাক্ষী লক্ষ্য করেছে দিনের পর দিন যায় চিন্ময়ের সেতারের ঢাকনি আর খোলা হয়না। তার সেতার একেবারে বোবা হয়ে গেছে। চিন্ময় কি বুঝতে পারেনা এতে কত কষ্ট হয় মীনাক্ষীর? বুঝতে পারেনা বাজানো ছেড়ে দিয়ে সে চিরদিনের জন্যে স্ত্রীকে অপরাধিনী করে রাখল। এই জেদের কি মানে হয়? নিজের ভালবাসার বস্তুকে এমন করে বিসর্জন দেওয়ার কি মানে হয়? মীনাক্ষী কি তার কাছে অন্যায় আবদার কিছু করেছে? মেয়েরা যা চায় শাড়ি, গয়না ঘর সাজাবার জন্যে দামী দামী আসবাবপত্র সে সব কিছু চেয়েছে? না, মীনাক্ষী অতটা স্থূল নয়, স্বার্থপর নয়। স্বামীর গৌরবই তার বড় গয়না। তার সুনাম নিয়েই সে গর্ব করতে চায়। সে অন্য কোন ধন-দৌলত সুখ-সম্পদের কাঙাল নয়।

স্নানটা সকালেই সেরে নিয়েছে মীনাক্ষী। খাওয়াটাও তার সঙ্গে সেরে নেওয়ার জন্যে চিন্ময় মাঝে মাঝে পীড়াপীড়ি করে। মীনাক্ষী

কোন কোন দিন স্বামীর সঙ্গে বসে খায়, সবদিন খেতে চায়না। বলে, 'উঁহু, আমি তো আর অফিসে যাচ্ছিনা, আমার অত তাড়া কিসের ?'

চিন্ময় বলে, 'তাড়া আর কি ! মুখোমুখি বসে খাচ্ছ, দেখেও সুখ।'

মীনাক্ষী হেসে বলে, 'দরকার নেই অত সোহাগে। আমার সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো। অফিসের খাওয়া, তুমি নাকে-মুখে গুঁজে ছুটবে। আমি অত কষ্ট করব কোন্ দুঃখে ? রাত্রে এক সঙ্গে গল্প করতে করতে খাব সেই ভালো।'

পাছে চিন্ময় ক্ষুণ্ণ হয় তাই অসুবিধার কথাটা ভালো করে বুঝিয়েই বলেছে মীনাক্ষী। অত সকালে খেয়ে নিলে আর ঘরের কাজকর্ম করা যায়না। ভারি আলস্য আসে শরীরে।

চিন্ময় অবুঝের মত জিজ্ঞাসা করে, 'কী এত কাজ থাকে রোজ ? মাত্র দু'জনের তো সংসার।'

মীনাক্ষী বলে, 'হলই বা দু'জনের সংসার। ঝামেলা কম নাকি ? এ তো আর তোমার অফিস নয়, যে ফাঁকি দেব। আজ নয় কাল বলে ফাইলগুলি ফিতে বেঁধে লুকিয়ে রাখব। এ আমার নিজের ঘরের কাজ। কিছু একটা বাদ পড়লে অস্বস্তির আর সীমা থাকেনা। তোমাদের পরের অফিসে কাজ করা অভ্যাস। এসব তোমরা বুঝবে কী করে ?'

কিন্তু এত বলা সত্ত্বেও চিন্ময় বুঝতে চায়না। মীনাক্ষী সারাদিন সংসারের জন্য বড় বেশি খাটে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত পরিশ্রম করে এই অভিযোগ চিন্ময়ের মুখে লেগেই আছে। ঝি-চাকর সব সময় পাওয়া যায়না। বেশি মাইনে দিতে চাইলেও লোকজন কখনো থাকে, কখনো কাজ ছেড়ে চলে যায়। তারা একজন মনিব কি তার স্ত্রীর মন জোগাবার চেয়ে ব্রীজ এরিয়ায় সরকারী মজুরের কাজকে বেশি সম্মানজনক মনে করে। তার টাকাও বেশি, মানও বেশি। মীনাক্ষী কত আর আদর-যত্নের লোভ দেখিয়ে তাদের ধরে রাখতে পারবে। কিন্তু চিন্ময় সে কথা বুঝতে চায়না। লোকজন নেই বলে

সে প্রায়ই আপসোস করে বলে, 'তোমার বড় বেশি গিন্নী গিন্নী ভাব হয়ে গেছে। এতটা গিন্নীপনা আমার মোটেই পছন্দ নয়।'

শোন কথা, ঘর-সংসার করতে হবে, তবু গিন্নীপনায় রাগ। মীনাক্ষী কি চিরকাল নতুন বউ হয়ে থাকবে? গত মাঘে ফোর্থ ম্যারেজ অ্যানিভারসারি গেলনা তাদের? তাছাড়া এখানে শাশুড়ীও নেই, বড়জা ননদও কেউ নেই যে তাঁদের কারো ওপর নির্ভর করবে, লজ্জা সঙ্কোচ করবে মীনাক্ষী। নিজের ঘর, নিজের সংসার সব যদি নিজে দেখে শুনে না করে, তাহলে চলবে কি করে?

চিন্ময় তবু বলে, 'অত খাটলে তোমার শরীর খারাপ হয়ে যাবে।'

মীনাক্ষী তাকে ভরসা দেয়, 'মোটেই তা যাবেনা, বরং হাত-পা কোলে করে বসে থাকলেই আমি ও বাড়ির মঞ্জুদির মত মুটিয়ে যাব। তখন আর তুমি আমাকে দু'চোখে দেখতে পারবেনা।'

স্বামীর এই আদর-যত্ন, তার শরীরের জন্যে চিন্ময়ের এই উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তা ভালোই লাগে মীনাক্ষীর। তার বন্ধুরা, মাসতুতো পিসতুতো বোনেরা প্রায় প্রত্যেক চিঠিতেই লেখে, 'তোর সুখ দেখলে হিংসে হয়। মনের মত বর পেয়েছিস বটে। একেবারে রামের মত স্বামী। চিন্ময়বাবুর মত বউ-প্রেমিক পুরুষ আজকাল আর দুটি মেলেনা।'

সে কথা ঠিক। চিন্ময় তাকে সত্যিই ভালোবাসে। তার হাতে পড়ে মীনাক্ষীর আজ আর কোন দুঃখ নেই। আশাতীত সুখশান্তিতে আছে সে। তবু একটু দুঃখ গিয়েও যায়না। মীনাক্ষী তার স্বামীকে যে ভাবে দেখতে চেয়েছিল, যে কীর্তির মুকুটে ভূষিত আর ভাস্বর করতে চেয়েছিল, তাতো আর হলনা, সেই সাধ তো আর মিটল না।

অথচ সেই সাধ আর সাধনার মধ্যেই তো প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল দু'জনের।

সেতার শেখার সখটা প্রথমে অবশ্য কলেজের সহপাঠিনী মানসী সেনের কাছ থেকেই পেয়েছিল মীনাক্ষী। পড়াশুনোয় তত ভালো

ছিল না মানসী, কিন্তু দেখতে ভালো। গাইতে জানে, বাজাতেও শিখেছে। তবে গানের চেয়ে তার সেতারের দিকেই টান বেশি। ছুটির পরে মীনাক্ষী মাঝে মাঝে মানসীদের চেতলার বাড়িতে যেত। নিজের জন্যে আলাদা একখানা ঘর পেয়েছে মানসী। তার এক ধারে বইয়ের র‍্যাক আর একদিকে সেতার, বাঁয়া-তবলা। সেতারের জন্যে কি চমৎকার ঢাকনিই না করেছে মানসী। তার সেই ঢাকনির রং দু'তিন মাস অন্তর অন্তর বদলায়। কখনো নীল, কখনো সবুজ, কখনো বেগুনী। বাজাবার আগে নিজেও সেজেগুজে বসে থাকে মানসী। খুব যে জমকালো সাজ তা নয়, ফিকে লাল কি হলদে রঙের শাড়ি পরে, কখনো বা সাদা খোলের শাড়িও ওকে পরতে দেখা যায়, কিন্তু তখন শাড়িখানার পাড়ের বাহার থাকে। চোখে সুর্মা পরে, ঠোঁটের রংটা এত অল্প ব্যবহার করে যে স্বাভাবিক রং বলেই মনে হয়। দীর্ঘ বেণী পিঠের ওপর দোলে। বেশ ছিমছাম পরিচ্ছন্ন। ও যে ঘটা করে সেজেছে একথা কেউ বলতে পারেনা, আবার সাজেনি একথাও চোখ স্বীকার করেনা।

মীনাক্ষী একদিন বলেছিল, 'আচ্ছা মানু, তুই এত সাজিস কার জন্যে রে ?'

মানসী জিভ কেটে জবাব দিয়েছিল 'ছিঃ ছিঃ ছিঃ! আমার সেতারের মাস্টারমশাই আসবেন আমি তার জন্য অপেক্ষা করছি। গানবাজনা হল শুদ্ধ পবিত্র জিনিস। গানের ঘর আমার কাছে মন্দির। যিনি আমাকে শেখান তাকে আমি গুরুর মত ভক্তি করি। যেমন তেমন বেশে তো তাঁর কাছে বসা যায়না, সুনীলবাবু তা পছন্দও করেন না।'

তারপর একদিন মীনাক্ষী নিজের মনের সাধ বন্ধুকে জানাল, 'আচ্ছা ভাই মানু, আমার হয়না ?'

মানসী বিস্মিত হয়ে বলল, 'কিসের হওয়া না হওয়ার কথা বলছিস ?'

'সেতার।'

মানসী ওকে উৎসাহ দিয়ে বলল, 'কেন হবেনা, নিশ্চয়ই হবে। তোর যখন এত আগ্রহ, তুই শেখনা। আমি মাস্টারমশাইকে বলে দিই। তাঁর কাছেই শিখতে পারবি তুই।'

মীনাক্ষী বলল, 'না ভাই, অমন কাজও করিসনে। আমার এই বয়সে কি আর ওসব হবে ?'

মানসী ওর গাল টিপে দিয়ে বলেছিল, 'আহা হা! তুমি এই আঠেরো বছরেই একেবারে বুড়ি হয়ে গিয়েছ।'

মীনাক্ষী বলল, 'তাছাড়া আমি অত টাকা পাবই বা কোথায় ? আমার বাবা তো বড়লোক নন। অফিসে যা মাইনে পান, কোন রকমে সংসার খরচটা কুলিয়ে যায়। চারটি ভাইবোন আমরা। প্রত্যেকেরই স্কুলের খরচ আছে। আমার একার জন্যে বাবা আর কত খরচ করতে পাববেন ?'

মানসীর মুখ গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। একটু চুপ করে থেকে বলেছিল, 'সুনীলবাবু আমাদের বাড়িতে সপ্তাহে একদিন আসেন। পঁচিশ টাকা করে দিই। তুই এক কাজ করতে পারিস। ওদের ভবানীপুরের বাড়িতে গিয়ে যদি শিখে আসিস, তাহলে আর অত টাকা লাগবেনা। আচ্ছা আমি ওকে বলে দেখব।'

ব্যবস্থাটা মীনাক্ষীর মা বেশি পছন্দ করেননি। এতগুলি ছেলেমেয়ের পড়াশুনোর খরচ জোগানো শক্ত, তারপর আবার গানবাজনা। কিন্তু মীনাক্ষীর বাবা তাকে খুব ভালোবাসেন। তিনি তার আবদার শুনে বললেন, 'আচ্ছা, তোর যখন এত সখ হয়েছে, শেখ কিছুদিন। কিন্তু পড়াশুনোর ক্ষতি হবে না তো ?'

মীনাক্ষী বলল, 'না বাবা, তুমি দেখো পড়াশুনো আমি ঠিক সমানে চালিয়ে যাব।'

দশ টাকায় রাজী হলেন সেতারী সুনীলকান্তি দত্ত, তবে তাঁর বাড়িতে গিয়ে আরো পাঁচজনের সঙ্গে মীনাক্ষীকে শিখতে হবে। প্রথম দিন মানসী নিজেই তাকে সঙ্গে করে নিয়ে বাড়ি চিনিয়ে দিল এবং সুনীলবাবুর সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ও করিয়ে দিল।

তিনি বললেন, 'ছাত্র-ছাত্রী বাড়াবার আমার আর ইচ্ছা ছিলনা। তত সময়ও নেই। কিন্তু তুমি নাকি মানসীর বিশেষ বন্ধু।'

তা অবশ্য ঠিক। মানসীর সুপারিশেই সব হচ্ছে। তবু ওভাবে কথাটা সুনীলবাবু না বললেই পারতেন। প্রথম দিনই একথাটা মনে হয়েছিল মীনাক্ষীর। মানসী তার প্রিয় বন্ধু, সুনীলবাবু সুদর্শন যুবক, সাতাশ-আঠাশ বছর বয়সেই বেশ নাম করেছেন। রেডিওতে নিয়মিত প্রোগ্রাম থাকে। তবু তাঁর প্রথমদিনের আচরণে ক্ষুণ্ণ না হয়ে পারেনি মীনাক্ষী। মানসীর মত সে পশারওয়ালা উকিলের মেয়ে না হতে পারে, নিজেদের বাড়ি গাড়ি না থাকতে পারে কিন্তু রূপে আর গুণে মানসীর পাশেই সে দাঁড়াতে পারে, এমনকি দু-এক ধাপ ওপরেও। ম্যাট্রিকুলেশন সে ফার্স্ট ডিভিসনেই পাস করেছে। কলেজেও ছাত্রী হিসাবে তারই সুনাম বেশি। প্রফেসররা মীনাক্ষাকেই বেশি পছন্দ করেন।

কিন্তু সুনীলবাবুর কাছে মীনাক্ষীর তেমন আদর হোলনা। যত দিন যেতে লাগল তত অনাদর বাড়ল। মীনাক্ষী লক্ষ্য করল তার সঙ্গে আরো যে সব মেয়ে আসে তাদের জন্যে সুনীলবাবু যতখানি সময় আর মনোযোগ দেন, মীনাক্ষীর ভাগে সেই তুলনায় সবই কম পড়ে। অথচ মীনাক্ষী তো কম খাটেনা সেতারের জন্যে। যে সব গৎ সুনীলবাবু তাকে তুলতে বলেন তা নিখুঁৎ ভাবে তুলতে মীনাক্ষী কম যত্ন করেনা। তার জন্যে কলেজের পড়া পর্যন্ত অবহেলা করে। তার সিনেমা-থিয়েটার গেল, আত্মীয়বন্ধুদের বাড়িতে বেড়ানো-টেড়ানো বন্ধ হল, ঘর-সংসারের কাজে ঘাটতি পড়ায় মার বকুনির মাত্রা বেড়ে চলল। তিনি প্রায়ই খোঁটা দিয়ে বলতে লাগলেন, 'সেতার বাজিয়ে মেয়ে আমাকে রাজা করবেন। আদর দিয়ে দিয়ে একেবারে দুলালী করে তুলেছে বাপ। টের পাবেন দু'দিন পরে। গরীবের কথা বাসি হলে কাজে লাগবে।'

এত গালমন্দ যাঁর জন্যে মীনাক্ষী তাঁর মন পেলনা। দু'দিন তাঁকে চায়ে নিমন্ত্রণ করল। তিনি দু'দিনই বাজে অজুহাতে এড়িয়ে

গেলেন। একদিন নিজের হাতে তাঁর সেতারের একটা ঢাকনি তৈরি করে দিল, তিনি নিতান্ত অনিচ্ছায় তা গ্রহণ করলেন। সামান্য একটা ধন্যবাদ পর্যন্ত দিলেন না।

এত অবহেলা অপমান কিসের জন্যে? এরপর থেকে মীনাক্ষীও তাঁর বন্ধুর কাছে অভিযোগ শুরু করল, 'সুনীলবাবু আমাকে মোটেই ভালো করে শেখাননা। ঠিক পঁচিশ মিনিটের বেশি সময় দিতে চাননা। কম টাকায় উনি তখন কেন রাজী হলেন বলতো মানু? এখনই বা এমন করছেন কেন?'

মানসী বলল, 'ছিঃ, উনি তেমন মানুষ নন। কতকজনকে তো বিনা টাকাতেও শেখান। টাকার লোভ ওঁর একেবারে নেই। বিয়ে-থা করেননি, অন্য কোনরকম বাজে খরচ কিছু নেই। একটা সিগারেট পর্যন্ত খাননা। যা রোজগার করেন তার অর্ধেক দাদা বউদিকে ধরে দেন আর বাকি অর্ধেক গরীব বন্ধুদের সাহায্য করেন।'

মীনাক্ষী বলল, 'তুই দেখি ওঁর অনেক খবর রাখিস।'

মানসী ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'রাখি বই কি। আমাকে তো অনেকদিন ধরে শেখাচ্ছেন।'

'সারা জীবন ধরেই শেখাবেন।' কথাটা জিবের ডগায় এলেও মুখ থেকে বেরোতে দিলনা মীনাক্ষী।

কয়েকদিন পরে মানসী নিজেই দুঃসংবাদটা বয়ে নিয়ে এল। 'তুই আর কাউকে ঠিক কর মিনু।'

মীনাক্ষী চমকে উঠে বলল, 'সেকি! তুই বুঝি পাঁচখানা করে লাগিয়েছিস ওঁকে?'

মানসী বলল, 'না, উনি নিজেই বললেন। ওঁর নিজের জন্যই আরো বেশি সময় ওঁর দরকার। আরো দুটো বেশি টাকার পুরোন টুইশন উনি ছেড়ে দিয়েছেন।'

মীনাক্ষী মনে মনে বলল, 'সবই ছাড়বেন, শুধু তোকে ছাড়া।' মানসী বলে চলল, 'উনি বললেন তুই ভালো করে পড়াশুনো কর,

সেইটাই তোর পক্ষে ভালো। আমার বোধহয় পড়াটাই শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দিতে হবে। তুই কুল রাখতে পারবনা। কিন্তু তুই লেখাপড়াটা ভালো করে কর। অনার্স নিয়ে বি, এ, পড়, এম, এ, পড়। জীবনে তারও যথেষ্ট দাম আছে।'

মীনাক্ষী রূঢ়ভাবে বলল, 'যাক যাক, তোর আর প্রোফেসরদের মত লেকচার দিতে হবেনা। বলিস, আমিও তাঁকে পঁচিশ টাকা করেই দেব।'

মানসী একটু হেসে বলল, 'তুই তাঁকে চিনিসনা। তিনি পাঁচশতেও আর রাজী হবেন না।'

তার কথাই সত্য হল। দু'দিন বাদে সুনীলবাবু লিখে পাঠালেন, মীনাক্ষী যেন অন্য ব্যবস্থা করে। আপাতত তাঁর সময়ের বড় অভাব হয়ে পড়েছে।

এই অপমানে মীনাক্ষী লুকিয়ে লুকিয়ে প্রথমে খুব কাঁদল। তারপর নিজে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল যে ভাবেই হোক সেতার সে শিখবেই। সুনীল দত্ত ছাড়া কি ভূভারতে আর দ্বিতীয় কোন সেতারী নেই? নিশ্চয়ই আছে। খোঁজখবর নিতেই বেরিয়ে পড়ল। চিন্ময় সরকারও রেডিও-আর্টিস্ট, সুনীল দত্তের চেয়ে বেশি লেখাপড়া জানে। বি, এ, পাস করেছে। শুধু টুইশন নির্ভর নয়, এ. জি. বেঙ্গলে চাকরি করে। পনের টাকাতেই সে বাড়ি এসে শেখাতে রাজী হয়ে গেল।

কথায় কথায় মীনাক্ষী আরও একটা খবর জানতে পারল। সুনীল দত্ত চিন্ময় সরকারে বন্ধু। একই ওস্তাদের কাছে তারা কিছুদিন একসঙ্গে শিক্ষা নিয়েছে।

তারপর মীনাক্ষী ঠিক মানসীর মতই সেজে এসে সুরগুরুর কাছে বসতে লাগল। তারও শাড়ি ব্লাউজের রং বদলায়, সেতারের ঢাকনির রং বদলায়। চিন্ময় তা খুশি হয়ে লক্ষ্য করে, শুধু তার সুর সাধনার নয় প্রসাধনেরও সুখ্যাতি করে। তার জন্যে আশাতীত বেশি সময় দেয়।

ছ'মাস গেল, বছর ঘুরে এল। চিন্ময় তার ছাত্রী সম্বন্ধে মোটেই ধৈর্যহীন হলনা। সুনীলের মত তাকে হতোদ্যম করলনা, বরং দিনের পর দিন তার সম্বন্ধে চিন্ময় আরো বেশি উৎসাহী হয়ে উঠল।

তারপর এমন হলো সপ্তাহে একদিন দেখে আশা মেটেনা, আরো দেখা-সাক্ষাতের ইচ্ছা হয়, প্রয়োজন হয়। লেক, গঙ্গার ধার, রেস্টুরেণ্টের পর্দা-ঢাকা কেবিনে তাদের যখন দেখা হল, আলাপ আর আলোচনা শুধু সেতারের তারগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইলনা।

মীনাক্ষীর মা প্রথমে এক আধটু বাধা দিলেন, তারপর সব বাধা তুলে নিয়ে একেবারে বিয়ের প্রস্তাবই করে বসলেন। চিন্ময় ঘাবড়ে গেলনা, আকাশ থেকে পড়লনা, বরং এ প্রস্তাবে তার স্মিত সম্মতিই পাওয়া গেল।

কিন্তু মীনাক্ষীর বাবা বললেন, 'আমি গরীব মানুষ। সামান্য চাকরি করি। আমি তো তোমার উপযুক্ত পণ-যৌতুক কিছু দিতে পারবনা।'

চিন্ময় উদারভাবে বলল, 'আপনাদের কিছুই দিতে হবেনা'। তারপর মীনাক্ষীকে একান্তে ডেকে বলল, 'পণ তো তোমরা আগেই দিয়েছ!'

মীনাক্ষী বলল, 'কী রকম।'

চিন্ময় হেসে বলল, 'ওই যে মাসে মাসে পনের টাকা করে মাইনে। এই দেড় বছর ধরে আমি যে কি শিখিয়েছি আর তুমি যে কি শিখেছ তাতো কেউ কারো চেয়ে কম জানিনা।'

মীনাক্ষী লজ্জায় মুখ নীচু করে বলল, 'আহা!'

আই-এ পরীক্ষাটা নমো নমো করে দিল মীনাক্ষী। পাস-ফেলের পরোয়া করলনা। পরীক্ষার ফল বেরোবার আগেই তাদের বিয়ে হয়ে গেল। বিয়েতে মানসী আর সুনীল দু'জনকেই নিমন্ত্রণ করেছিল মীনাক্ষী। মানসীকে নিজে বাড়িতে গিয়ে বলে এসেছিল আর সুনীল দত্তকে অবশ্য তার বাবার জবানীর চিঠি পাঠিয়েছিল। হলদে রঙের

কাগজে সোনালী রঙের ছাপা শুভ-বিবাহের চিঠি। যে চিঠিতে লেখা থাকে, 'পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম, ত্রুটি মার্জনা করিবেন।'

মানসী যতই বলুক, সুনীল দত্তের হৃদয় উদার নয়। ত্রুটি তিনি মার্জনা করেননি। বিয়েতে আসেনওনি, কোন উপহারও পাঠাননি।

দামী শাড়ি নিয়ে মানসী নিজে এসেছিল, হেসে বলেছিল, 'খুব খুশি হলাম ভাই। তুই আমার উপর টেক্কা দিয়েছিস।

খুব যে খুশি হয়েছে মানসীর মুখ দেখে কিন্তু তা মীনাক্ষীর মনে হয়নি, তার হাসি আর কথা শুনেও না।

বিয়ের পরে মীনাক্ষী টের পেল চিন্ময় তার কাছে একটা কথা গোপন করে গেছে। তার কাছেও করেছে, নিজের মার কাছেও করেছ। বিয়েতে বাবা শুধু তাকে শাঁখা-সিঁদুর দিয়েই পার করেননি, ভরি দশেক সোনার গয়নাও দিয়েছিলেন। যে জন পনের বরযাত্রী নিয়ে এসেছিল চিন্ময়, তাদেরও ভালো করেই খাইয়েছিলেন। তবু চিন্ময় নিজের বাড়িতে আত্মীয়-বন্ধুদের খাওয়াতে আর নতুন বউকে শাড়ি গহনা উপহার দিতে হাজার খানেক টাকা দেনা করে বসেছে। অথচ মা আর জ্যেঠতুতো ভাইকে বলেছে সব টাকাই তার শ্বশুর দিয়েছেন।

একথা শুনে মীনাক্ষী বলেছিল, 'ছি ছি ছি, মিথ্যে কথা কেন বলতে গেলে? তুমি যে বিনা পণে গরীবের মেয়েকে বিয়ে করছে, একথা ওঁদের জানিয়ে দিলেই হত।'

চিন্ময় বলল, 'মা তাতে খুশি হতেন না। বিয়েতে মতও দিতেন না। তাঁর অনেক বড়লোক বেয়াই পাওয়ার সুযোগ ছিল। তুমি ভেবোনা, আমার দেনা আমি যেভাবে পারি শোধ করে দেব।'

চিন্ময় টুইশনির সংখ্যা বাড়িয়ে দিল, সিগারেটের খরচ কমাল, তবু দেনা শোধ হয়না। বিয়ের পরে দাদা তার কাছ থেকে আরো বেশি টাকা আশা করেন। আর চিন্ময়ের মা সব ব্যাপার জানতে পেরে মুখ ভার করে আছেন তো আছেনই।

তারপর একদিন মীনাক্ষী বলল, 'তুমি যদি অত টুইশনি কর, নিজে রেওয়াজ করবে কখন ?'

চিন্ময় গম্ভীরভাবে জবাব দিয়েছিল, 'আমার কথা তোমাকে ভাবতে হবেনা।'

মীনাক্ষী বলেছিল, 'সুনীলবাবুর প্রোগ্রাম এখন খুব ভালো হয়েছে। অথচ এর আগে তোমার প্রশংসাই তো লোকে বেশি করত।'

চিন্ময় বিরক্ত হয়ে বলেছিল, 'আঃ থামো !'

তারপর একটু বাদে তাকে কাছে টেনে নিয়ে নিজের রূঢ়তাকে শুধরে দিয়ে বলেছিল, 'আমার প্রশংসা শুধু তুমি করলেই যথেষ্ট।'

এই সময় এল বদলী হওয়ার প্রস্তাব। ইচ্ছা করলে চিন্ময় প্রস্তাবটা যে এড়িয়ে যেতে না পারত তা নয়, কিন্তু সে সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে নিল।

মীনাক্ষী প্রথমে একটু আপত্তি করেছিল, 'কলকাতার বাইরে গেলে কি তোমার গান-বাজনার চর্চা ঠিক মত চলবে ?'

চিন্ময় বলল, 'কেন চলবেনা ? সমস্ত সুর কি কলকাতাতেই আছে, তার বাইরে নেই !'

চিন্ময় তাকে হিসাব করে বুঝিয়ে দিল, বাইরে গেলে অনেক কম খরচ লাগবে। সেখানে বাড়িভাড়া নামমাত্র, বাজে ব্যয়ের কোন সুযোগ নেই, লোক-লৌকিতার কোন প্রয়োজন হবেনা। সেখানে দশটা-পাঁচটা চাকরি আর অবসর সময়ে সেতার মাঝখানে আর কিছু নেই, কেউ নেই। যেটুকু হারিয়েছে পুনরুদ্ধারের জন্যে এই নির্জনবাসই প্রশস্ত। বেশিদিনের জন্যে তো নয়, এক বছর, বড় জোর দু'বছর। তারপর ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসবে।

মীনাক্ষী বলেছিল, 'আমাকে নিয়ে যাবেতো ?

চিন্ময় হেসে জবাব দিয়েছিল, 'উঁহু, তোমাকে সুনীলের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে যাব। তার কাছে ফের সেতার শিখবে।'

মীনাক্ষী ভ্রূ কুঁচকে রাগের ভান করে বলেছিল, 'ফাজিল কোথাকার!'

মীনাক্ষী সব দিক ভেবে খুশিই হয়েছিল। কলকাতার বাইরে সে কোনদিন যায়নি, এই প্রথম। ছুটিছাটায় বেশ বেড়াতে পারবে। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল টাউনগুলি ঘুরে ঘুরে দেখবে। বাঁধ, ব্যারেজ, পাওয়ার-হাউস—যে সব আশ্চর্য জিনিসগুলির কথা কাগজে পড়েছে তা নিজের চোখে দেখতে পারবে মীনাক্ষী।

আর একটা সুবিধা হবে। কিছুদিন ভাসুর আর শাশুড়ীর কাছ থেকে একটু দূরে থাকতে পারবে। মাঝে মাঝে একটু ব্যবধান থাকা দরকার ওদের সামনে ভালো করে রেওয়াজটা পর্যন্ত করতে পারেনা। কেমন যেন লজ্জা করে, কেমন যেন নিজেকে অপরাধিনী বলে মনে হয়।

হিসাবে কারোরই ভুল হয়নি। বিয়ের জন্যে যে দেনাটা হয়েছিল চিন্ময়ের, ওভারটাইম খেটে আয় বাড়িয়ে এবং জীবনযাত্রার ব্যয় কমিয়ে তা দু'বছরের মধ্যে শোধ হয়ে গেছে।

ছুটির দিনে স্বামীর সঙ্গে মাইথন, সিন্ধ্রি, বোখারো—এক একবার এক একটা জায়গা দেখে এসেছে মীনাক্ষী। তারপর পাতার পর পাতা বর্ণনা করে চিঠি লিখেছে বোনদের, মানসীকে এবং আরও অনেক আত্মীয় বন্ধুকে। জবাবে সবাই লিখেছে, 'তোর মত সুখী আর কেউ নেই। স্বামীর এমন সোহাগ আর কেউ পায়না। –ষোলআনা সুখ কাকে বলে, তুই তা দেখে নিলি।'

মীনাক্ষীও তাই ভেবেছিল। সুখে আছে সে, পরম সুখে আছে। এর চেয়ে বেশি আর কিছু হতে পারেনা। নিজের ঘর, নিজের সংসার। মাঝখানে শাশুড়ী মারা যাওয়ায় অবশ্য দুঃখের কারণ ঘটেছে। তবে তাঁর বয়সও ষাট ছাড়িয়ে গিয়েছিল। মাতৃশোক অল্প দিনেই সামলে নিল চিন্ময়। তবু সব শোক গেলনা।

প্রথমে আঘাত পেল মীনাক্ষী হঠাৎ একদিন রেডিও শুনে। সুনীল আর মানসী দু'জনেরই প্রোগ্রাম ছিল রাত্রে। একজন

বাজিয়েছে পিলু আর একজন ভূপালী। আশ্চর্য, কী করে ম্যানেজ করল ওরা? একই সঙ্গে কী করে প্রোগ্রাম পেল ওরা?

মীনাক্ষী স্বামীকে বলল, 'শুনলে?'

চিন্ময় বলল, 'শুনলাম।'

'তুমি অনেকদিন কন্‌ট্রাক্ট পাওনি।'

চিন্ময় বলল, 'পেয়েছিলাম। ছুটি না পাওয়ায় সেটা নষ্ট হয়ে গেছে।'

মীনাক্ষী রাগ করে বলল, 'ছি ছি ছি, একথা আমাকে আগে জানাওনি কেন?'

চিন্ময় পাশ ফিরে জবাব দিয়েছিল, 'জানালেই বা কি হত? তাছাড়া আমার প্রোগ্রাম মোটেই ভালো হতনা। কতদিন প্র্যাকটিস নেই।'

'তাই বল। তুমি ইচ্ছা করে কণ্ট্রাকট ক্যানসেল করে দিয়েছে। ছুটি না পাওয়ার অজুহাতটা একবারে বাজে।'

একথার কোন জবাব দেয়নি চিন্ময়।

মীনাক্ষী ওদের খবর মাঝে মাঝে প্রায়ই পায়। কখনো চিঠিপত্রে, কখনো খবরের কাগজে সংস্কৃতি সংবাদের স্তম্ভে। সুনীল আর মানসী আজকাল কলকাতার নানা আসরে একসঙ্গে বাজায়। দু'জনেরই সুখ্যাতি দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। কিন্তু ওরা আজও বিয়ে করেনি। কেন করেনি কে জানে। আর কি বাধা আছে? বিয়েটা বাকি রেখেছে কেন? একজন বামুন আর একজন কায়েত বলে, মানসীর বাবা ভুবন মুখুজ্যে এ ব্যাপারে আপত্তি করেছেন বলে? এ একটা অজুহাতই নয়। বাপের মতামতকে তো আজকাল ভারি গ্রাহ্য করে মানসী। গ্রাহ্য করলে আর অমন যেখানে-সেখানে একসঙ্গে ঘোরাঘুরি করতে পারতনা। তবে কোন্ কারণে ওরা একসঙ্গে ঘর বাঁধছেনা, শুধু সেতারের তার বেঁধেই সুখে আছে?

প্রথম প্রথম দুএকদিন সেতার নিয়ে বসত চিন্ময়, আজকাল একেবারেই বসেনা। মীনাক্ষী কতদিন রাগ করেছে, অভিমান করেছে,

অনুনয় করেছে, 'দেখ, আমার ছিল শখ, কিন্তু তোমার তো সাধনার জিনিস, তুমি কেন ছেড়ে দিচ্ছ ?'

চিন্ময় হেসে বলেছে, 'সাধনার ধারাও তো বদলায়। আজ আমি সংসার-ধর্মের সাধক।'

মীনাক্ষী বলেছে, 'বাজে কথা। যারা রাঁধে তারা কি আর চুল বাঁধে না ?'

চিন্ময় হেসে বলেছে, 'ওই চুলই বাঁধে। তুমি যতক্ষণ ধরে চুল বাঁধো, আমি ততক্ষণ ধরে, তত নিখুঁৎ করে দাড়ি কামাই। ছুটোই শিল্প-চর্চা।'

মীনাক্ষী জবাব দিয়েছে, 'তোমার যত সৃষ্টিছাড়া কথা। যারা সংসার করে, চাকরি-বাকরি করে, তারা বুঝি আর লেখে না ? আঁকে না ? গায় না, বাজায় না ? তারা বুঝি আর শিল্পী হয় না ?'

'হবে না কেন ? আধখানা হয়, সিকিখানা হয়। পুরোপুরি হওয়া শক্ত।'

মীনাক্ষী বলে, 'তুমি অন্তত ছু'আনি হও। আমি তাতেই খুশি হব। একেবারে কিছু না হওয়ার চেয়ে সেই ছু'আনি হওয়াও ভালো।'

চিন্ময় হাসে, 'মানে ষোল আনা সংসার আর সেই সঙ্গে আরো ছু'আনা সন্ন্যাস। মীনু অত লোভ কোরোনা, ষোলআনার ওপর আঠারো আনা চেয়োনা। তার চেয়ে আমরা যা আছি, তাই ভালো। সুরের বাধনের চেয়ে বিয়েব বাঁধন বেশি টেঁকসই, তা বজ্র আটুনি, ফসকা গেরো নয়। তাতে সব রকম ভারই সয়।'

এ সব হেয়ালীর কি যে মানে হয়, তা মীনাক্ষী বুঝতে পারে না। শুধু দেখে তার স্বামী দিনের পর দিন অকেজো হয়ে যাচ্ছে। অফিসে তার মাইনে বেড়েছে, পদোন্নতি হয়েছে। সেদিক থেকে খুবই কাজের লোক হয়ে উঠেছে চিন্ময়। কি সুরসৃষ্টির দিক থেকে একেবারে নিস্ফল, অকর্মণ্য।

কেন এমন হল ? মীনাক্ষীর মাঝে মাঝে মনে হয় সুনীলবাবু পর হয়ে তাকে যতখানি আঘাত দিয়েছেন, অপমান করেছেন, তার

চেয়ে বেশি আঘাত করছে তার স্বামী। তার ভালোবাসার আগুন কেন সুরের আগুণ হয়ে জ্বলে উঠছে না? তাতে যে মীনাক্ষীর মান অনেক উঁচুতে উঠে যেত, একজনের গৌরবে দু'জনের গৌরব, একজনের সিদ্ধিতে দু'জনে সার্থক হত। তা কেন হতে দিচ্ছে না চিন্ময়?

চিন্ময় আজকাল মন দিয়ে অফিস করে, সংসারে আরো মনোযোগ দেয়, শৌখীন আসবাবে ঘর সাজায়, মৌশুমী ফুলে বাগান সাজায়, দিন নেই, রাত নেই সোহাগে আদরে মীনাক্ষীকে অস্থির করে তোলে। তবু চিন্ময় যা হতে পারত তা হলনা, এ দুঃখ মীনু ভোলে কী করে?

ঠক ঠক ঠক!

কড়া-নাড়ার শব্দে চমকে উঠল মীনাক্ষী। চিন্ময় ফিরে এল বুঝি। স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে গিয়ে মন দিয়ে কাজ করতে পারছে না। তাই বিবাদ মিটিয়ে নেওয়ার জন্যে মাথাধরার অজুহাতে অফিস থেকে পালিয়ে এসেছে।

কিন্তু দোর খোলবার পর ভুল ভাঙল মীনাক্ষীর। চিন্ময় নয়, পাশের বাড়ির মঞ্জুদি এসেছে। এখন চিন্ময় বড় অফিসার হয়েছে। এখন কি আর যখন তখন অফিস পালাতে পারে?

মঞ্জু বলল, 'ঘুমুচ্ছিলি না কি? এতক্ষণ ধরে কড়া নাড়ছি, শুনতেই পাস না।'

মীনাক্ষী চুপ করে রইল।

মঞ্জু বলল, 'চল।

আমরা তিনজন হয়েছি। তোকে নিয়ে চার। আয় ব্রীজ খেলবি।'

মীনাক্ষী বলল, 'মাপ করো মঞ্জুদি, শরীরটা ভালো না।'

মঞ্জু মীনাক্ষীর সর্বাঙ্গে চোখ বুলিয়ে মুখ টিপে হেসে বলল, 'ওরে, ও বড় সুখের অসুখ। সবে তো চারমাস পড়েছে, দিন আরো এগোক, তখন দেখবি। তখন আর বিছানা ছেড়ে মোটে উঠতে চাইবি না, ঘর থেকে বেরোন তো দূরের কথা। যতদিন সেই সঙ্গীন অবস্থা না হচ্ছে—'

মীনাক্ষী লজ্জিত হয়ে বলল, 'আঃ, কি শুরু করলে মঞ্জুদি !'

মঞ্জু বলল, 'চল তাহলে।'

না মঞ্জুদি, রান্নাঘরের কাজ এখনো মেটেনি, আমরা খাইনি এখনো।'

মীনাক্ষী অপরাধীর মত স্বীকার করল।

মঞ্জু বলল, 'তাই বল। তাইতো মুখখানা শুকিয়ে অমন আমসি হয়েছে। দুপুর গড়িয়ে গেল এখনো খাসনি কেন? আজ আবার ঝগড়া হয়েছে বুঝি? তোদের কী নিয়ে অত ঝগড়া হয়রে?'

মীনাক্ষী হেসে বলল, 'কী যে বাজে কথা বল! আমাদের মোটেই ঝগড়া হয়না। তুমি যাও, আমি রান্নাঘরের পাট সেরে এক্ষুনি আসছি।'

মঞ্জুকে দোর থেকে বিদায় দিয়ে মীনাক্ষী ফের ঘরে ঢুকল।

বিহারের এই রুক্ষ জায়গায় মার্চ মাসেই বেশ গরম শুরু হয়েছে। বাইরে ঝাঁ ঝাঁ করছে দুপুর। চারদিকে কোন সাড়াশব্দ নেই। রান্নাঘরেব দিকে এগোতে এগোতে মীনাক্ষীর আর একবার চোখে পড়ল রঙীন ঢাকনিতে ঢাকা একজোড়া সেতার বহুদিন ধরে স্তব্ধ হয়ে রয়েছে।



বনভোজন

বাসটা বাগানবাড়ির সামনে এসে দাঁড়ারার পর গোলমালে কি ঝাঁকুনিতে শঙ্করের তন্দ্রা ভেঙে গেল। সে নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসে বলল, 'আমরা পৌঁছে গেছি তাহলে ?'

বন্ধু প্রভাত পাশেই বসে ছিল। সে ধমকে উঠল, 'পেঁীছাবো না ? তুমি কি ভেবেছিলে অনন্তযাত্রা ? আচ্ছা মানুষ যা হোক। বেলগাছিয়া থেকে এই সুখচর পঁয়ত্রিশ মিনিটের জার্নি। এই সময়টুকুও তুমি না ঘুমিয়ে পারলে না ? বেলা দশটার সময় আমার কাঁধে মাথা রেখে দিব্যি এক ঘুম।'

শঙ্কর একটু হাসল, 'তাই নাকি ? কিন্তু তোমার কাঁধটা বড় শক্ত। বালিস হিসেবে মোটেই উপভোগ্য নয়। কাল সারারাত জেগেছি যে। তাই বড্ড ঘুম পেয়েছিল।'

প্রভাত চাপা গলায় বলল, 'জেগে তো একেবারে দেশোদ্ধার করেছ। ফ্লাশ খেলে যথাসর্বস্ব খুইয়ে—।'

শঙ্কর নিজের ঠোঁটে তর্জনী ছোঁয়াতে প্রভাত থেমে গেল।

পিকনিক পার্টির যাত্রীরা ততক্ষণে নামতে শুরু করেছে। এ বাসটায় প্রায় সবই পুরুষ। দুএকজন মহিলা যা আছেন তাঁরা প্রৌঢ়া। চোখ মেলে দেখবার মত কিছু নেই। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এসে এমন কিছু লোকসান হয়নি ভেবে শঙ্কর নিজের মনেই একটু হাসল।

প্রভাত তাড়া দিল, 'কই হে ফোটোগ্রাফার, ওঠো। নাকি আবার ঘুমিয়ে পড়লে ?'

বাস প্রায় খালি হয়ে গেছে। ক্যামেরা কাঁধে শঙ্কর বন্ধুর পিছনে পিছনে এবার নেমে এল। নেমে চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। শোভাবাজারের কোন এক রাজার বাগানবাড়ি। বাগান এখন আর বলা যায় না। যারা অযত্নেও বাড়ে সেই ঘাস আর

লতাগুল্মই প্রাঙ্গণ জুড়ে রাজত্ব করছে। পুকুরটা মজে গেছে। ঘাটের সিঁড়িগুলি ফাটল ধরা। গঙ্গার ধার ঘেঁষে যে দোতলা বড় বাড়িটা এখনো দাঁড়িয়ে আছে তার জীর্ণ দেহে এখন আর কোন আভিজাত্যের ছাপ নেই। কতকাল যে কলি ফেরানো হয় না তার ঠিক কি। উদ্যান না বলে একে অরণ্য বলাই ভাল।

অন্যমনস্ক নিস্পৃহ শঙ্কর হঠাৎ চমকে উঠল। ওই সেকেলে বাড়িটার ভিতর থেকে একদল একেলে তরুণী বেরিয়ে এসেছে। অরণ্যে সত্যিই ফুল ফুটেছে এবার। সে কালের বাগানে একালের মঞ্জরী। সতের থেকে সাতাশের মধ্যে পাঁচ-ছটি নানা বয়সের মেয়ে প্রভাতের সামনে এসে দাঁড়াল। তিনটির সিঁথিতে সিঁন্দুর আছে। কিন্তু মাথায় কারো আচল নেই। শঙ্কর দেখে খুশি হল—এরা শুধু অনবগুণ্ঠিতা নয় আজ, অকুণ্ঠিতাও বটে। বেশিরভাগই মধ্য-বিত্ত ঘরের। দু'একটি আছে যারা দু'চার ইঞ্চি উঁচু ধাপের। কিন্তু আজ আর তা বুঝবাব উপায় নেই। প্রত্যেকের পরনে জমকালো শাড়ি, চোখে মুখে উৎসবের উজ্জ্বলতা। কমবেশি স্বচ্ছল সংসারের অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে পারিবারিক রীতি-নীতি বিধিনিষেধের বাইরে এরা আজ একটি শিকল-ছেঁড়া বেপরোয়া দিন কাটাতে এসেছে।

তারা এগিয়ে এসে প্রভাতকে ঘিরে ধরল। পঁচিশছাব্বিশ বছরেব সিন্দুববতী সুন্দরী মেয়েটিই বোধহয় দলের নেত্রী। সে মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'এত দেরি করলে যে প্রভাতদা। আমরা সেই কখন থেকে এসে বসে আছি।'

প্রভাত বলল, 'বসে আর আছ কই, রঙীন প্রজাপতি হয়ে উড়ে বেড়াচ্ছ। আমরা তো আর তোমাদের মত পাখি হয়ে জন্মাইনি। জিনিসপত্র বাসনকোসন সব জোগাড় করে বাজাবটাজার সেরে তবে আসতে পেরেছি। তোমাদের মত সারা গায়ে রঙ মেখে পাখা মেলে—'

মেয়েটি হেসে উঠে বলল, 'থাক থাক, আপনাকে আর কবিত্ব করতে হবে না। আপনি যে কত কাজের লোক তা যেন আমি আর

জানি না। আপনার মুখেই সব।' ভ্রু বাঁকিয়ে অপূর্ব ভঙ্গিতে মেয়েটি আবার হাসল।

এতক্ষণে বন্ধুকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কথা মনে পড়ল প্রভাতের।

'তোমরা জানো ইনি কে? বিখ্যাত ফোটাগ্রাফার শঙ্কর সেন। মেসে পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছিলেন। জোর করে ধরে তুলে নিয়ে এলাম। জানো পদ্মা, আমাদের এই পিকনিক পার্টি নিয়ে আমরা একটি ফিল্ম তৈরি করব। তার ক্যামেরাম্যান এই শঙ্করপ্রসাদ।'

পদ্মা বলল, 'আর আপনি? আপনি বুঝি স্বয়ং ডিরেক্টর?'

'উঁহু' তুমি যদি হিরোইন হও আমি তাহলে নায়কের রোলটির জন্যে আবেদন করব।'

পদ্মা বলল, 'আবেদন এক কথায় নামঞ্জুর হবে। নায়ক এখানে সশরীরে আছেন।'

প্রভাত বলল, 'তাহলে উপনায়ক। শাখা-প্রশাখায় যেখানেই হোক একটু জায়গা রেখ। শঙ্কর, ইনি আমার বউদির সহোদরা শ্রীমতী পদ্মা মৈত্র। দুই বোন যদি দুই জা হতেন তাহলে সম্পর্কটা বড়ই মধুর হত। কিন্তু ইনি আগে থেকেই বাক দান করে রেখেছিলেন। শুধু বাক্য নয়, কায় আর মনও।'

পদ্মা এবার লজ্জিত হয়ে বাধা দিয়ে বলল, 'আঃ কী হচ্ছে প্রভাতদা। আপনি বক বক করুন; আমি চললাম।'

প্রভাত বলল, 'দাঁড়াও না। পরিচয় পর্বটা এখনো শেষ হয়নি। ইনি শ্রীমতী কুমকুম রায় পদ্মার মাসতুতো বোন, চোরে চোরে মাসতুতো ভাই হয়। আর যারা রাহাজানি করে তারা দুই মাসতুতো বোন হয়ে জন্মায়। ইনি সর্বানী দত্ত; রসায়নের অধ্যাপিকা। চশমা আর চেহারা দেখে নিশ্চয়ই চিনতে পারছ। আরে ছায়া তুইও এসে পড়েছিস দেখছি। আমার কনজারভেটিভ পিসেমশাই তোকে ছেড়ে দিলেন? এইসব ম্লেচ্ছদের সঙ্গে মিশলে তোর যে আর বিয়ে হবে না রে?'

কালো ছিপছিপে চেহারার মেয়েটি লজ্জায় চোখ নামাল। বড় শান্ত আর স্নিগ্ধ তুটি চোখ। বেলা দশটার এই কড়া রোদকেও যেন ভুলিয়ে দেয়। ছোট এই ছবিটুকু ক্যামেরায় ধরে নিতে পারলে মন্দ হত না। মাথায় অনেক চুল, সরু-সিঁথি এখনো সাদা। প্রভাতের পিসেমশাই খুব যে রক্ষণশীল তাতো মনে হয় না। তাহলে এ-মেয়ে এতো দিনে অরক্ষণীয়া হয়ে উঠত। দেখতে রোগাটে হলেও এর বয়সই বা কোন্ বাইশ তেইশ বছর না হবে।

লাজুক মুখচোরা মেয়েটির হয়ে পদ্মাই জবাব দিল, 'কী যে বলছেন প্রভাতদা। ওসব অলুক্ষণে কথা আর বলবেন না। এমনিতেই পিসেমশাই ওর বর খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গেলেন।'

ছায়া মৃতু প্রতিবাদের সুরে বলল, 'বাজে কথা।' শঙ্করের মনে হল পদ্মার কথা বাজে হতে পারে কিন্তু ছায়ার মুখের ওই তুটি শব্দ যেন গান হয়ে বেজে উঠেছে। ওর গলার সুরটুকুতো ভারি মিষ্টি।

ঘরের ভিতর থেকে এবার একজন স্থূলাঙ্গী প্রৌঢ়া মহিলা বেরিয়ে এলেন, 'ও প্রভাত, তোরা কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেবল গল্পই করবি। খাবারটা খেয়ে নিয়ে আমাকে অবসর করে দিয়ে যা। কত বেলা হয়ে গেল। এরপর কখন যে রান্না চড়বে, কখন যে কি হবে কিছু জানিনে বাপু।'

প্রভাত বলল, 'যাই মাসীমা চল হে শঙ্কব চল, ব্রেক ফাস্ট সেরে ফেলা যাক। পদ্মা তোমরাও এসো।'

পদ্মা বলল, 'আপনারা যান। আমাদের হয়ে গেছে। আমরা যারা আগের বাসে এসেছি তাবা আগেই খেয়ে নিয়েছি।'

প্রভাত বলল, 'কী অন্যায়। বেশ খাওয়াটা না হয় সেরেছ, পরিবেশনটা এবার হোক।'

পদ্মা হেসে বলল, 'তার জন্যে ঠাকুর-চাকর আছে। আমাদের আশা আর করবেন না।'

মাসীমার তাড়া খেয়ে প্রভাত এবার ভিতরের দিকে এগিয়ে গেল। শঙ্করও চলল তার পিছনে।

বাসের সহযাত্রীরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে খাবার খাচ্ছে। শঙ্কর মনে মনে ভাবল এরা শুধু ভোজন রসিক, দর্শন রসিক নয়। একটু আগে কী যে আশ্চর্য কাণ্ড ঘটে গেল তা কেউ টেরও পেল না। এরা শুধু খেতেই ব্যস্ত।

খাওয়ার ব্যবস্থাটা অবশ্য প্রাতর্ভোজ হিসাবে ভালোই হয়েছে। একটি করে ডিমসিদ্ধ, তুটি করে কলা, রুটি মাখন আর মাটির খুরিতে করে চা। ভাঁড়ার সামলাচ্ছেন তিন চারজন বয়স্কা মহিলা। দেখলেই মনে হয় এঁরা পাকাপোক্ত গৃহিণী। স্বর্গে এসেও ধান ভানতে শুরু করেছেন।

চা শেষ করে খুরিটা ছুঁড়ে ফেলে দিল শঙ্কর। পোড়া মাটির একটা অদ্ভুত গন্ধ। ট্রেনে যেতে যেতে নাম না জানা কিংবা জেনেও মনে না রাখা ছোট ছোট স্টেশন-গুলিতে বিচিত্র অবস্থায় চা খাওয়ার কথা মনে পড়ে গেল। একবার তাড়াতাড়ি চা খেতে গিয়ে ঠোঁট পুড়ে গিয়েছিল, আর একবার এক শৌখিন সহযাত্রীর সিল্কের পাঞ্জাবির ওপর পড়ে গিয়েছিল চায়ের ভাঁড়। যায় আর কি কুরুক্ষেত্র বেঁধে। আর একবার চা খাওয়াটা নির্বিঘ্নেই শেষ হয়েছিল কিন্তু বেচারা চাওয়ালার হাতে চারটে পয়সা পৌঁছে দেওয়ার আগেই গাড়ি ছেড়ে দিল। বুকটা পুড়ে উঠেছিল এক মুহূর্তের জন্যে।

উঠানে নেমে প্রভাত বলল, 'এখানে আমাদের নিয়ম কারো সঙ্গে কারো আলাপ করিয়ে দেব না। যে যাকে দেখে উৎসুক হবে সে তার সঙ্গে নিজেই আলাপ করে নেবে। দেখতে পাচ্ছ এরই মধ্যে কতগুলি দল হয়ে পড়েছে। তুমি যে দলে খুশি ভিড়ে পড়তে পার। তু-মিনিট বাদে যদি দেখ যে ভুল করেছ, তুমিও খুশি হচ্ছ না, কাউকে খুশি করতে ও পারছ না, তুমি নিঃশব্দে, কি 'ধুত্তোর' বলে সশব্দে সরে আসতে পার। কেউ কিছু মনে করবে না, আর করলেই বা কি এসে যায়।'

শঙ্কর হেসে বলল, 'তোমার নিয়ম-কানুন আমি সব বুঝে নিয়েছি। তোমাকে আর বক্তৃতা করতে হবে না।

প্রভাত বলল, 'বালবৃদ্ধবনিতায় এখানে আমরা পঁয়ষট্টি জন এসেছি। সংখ্যাটা এইরকমই ঠিক হয়েছিল। জানি না, পরে আরো দু-চারজন বেড়েছে কিনা। এদের মধ্যে আমি প্রায় টুথার্ড ধরো জন চল্লিশকে চিনি। তাঁদের সবগুলি নাম যদি গড় গড় করে বলে যাই, তুমি কি আজ বাদে কাল তা মনে রাখতে পারবে?'

শঙ্কর বলল, 'ছেলেদের নাম অবশ্য শোনার সঙ্গে সঙ্গে ভুলে যাব। কিন্তু মেয়েদের নামের বেলায় আমি শ্রুতিধর। কানের ভিতর দিয়ে সেই যে মরমে প্রবেশ করে আর কিছুতেই বেরোতে চায় না।'

প্রভাত হেসে বন্ধুর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, 'বেশ বলেছ। তা তুমি এক কাজ কর। অর্ডার দিয়ে এক নতুন নামাবলী তৈরী করাও। তাতে রাম নামের ছিটেগন্ধও থাকবে না। শুধু রমা, মনোরমা, হৃদি-রমাদের হাজার হাজার নাম লেখা থাকবে। সেই নামাবলী দিনরাত গায়ে জড়িয়ে রেখে তুমি সব জ্বালা জুড়াতে পারবে।'

শঙ্কর হেসে বলল, 'কথাটা মন্দ বলনি। কলিযুগে আমাদের মত বেকার যুগন্ধরদের শুধু নামই ভরসা। কায়াতো ভালো সিনেমায় গিয়ে যে ছায়া দেখবে সে।পয়সাটি পর্যন্ত যাদের জোটে না তাদের 'নাম ধর্ম, নাম কর্ম, নাম কর সার—এ মন্ত্র জপ করা ছাড়া আর উপায় কি।'

প্রভাত বলল, 'থাক থাক ওসব কথা আজ নয়। দেখি পদ্মারা সব কোথায় গেল।'

বন্ধুকে পাশ কাটিয়ে সরে পড়তে দেখে শঙ্কর নিজের মনেই একটু হাসল।

প্রভাত রায় কলেজে এক সময় তার সহপাঠী বন্ধুই ছিল। আজ বাইরে মাঝে মাঝে ডাকে খোঁজ করলেও ভিতরে ভিতরে অনেক দূরে সরে গেছে। যাবেই তো। নামজাদা তেল কোম্পানীতে এখন কাজ করে প্রভাত। ছশো টাকা মাইনে পায়, অফিসের গাড়ীতে যাতায়াত করে। জীবনের পথ এখন ওর তৈল মসৃণ। শঙ্করের মতই প্রভাতও তিরিশ পার হয়েছে। কিন্তু এত বড় চাকরি

করেও বিয়েতে ওর গরজ নেই। এদিকে ওদের ড্রয়িংরুমে অনূঢ়া কন্যার বাপ-খুড়োদের ভিড় বেড়ে চলেছে। কিন্তু প্রভাতের মন পড়ে আছে নাকি সমুদ্রপারে, লণ্ডনে কোন এক মনস্তত্ত্বের বিদ্যার্থিনীর কাছে। বিমান ডাকে ফি সপ্তাহে চিঠি যায় আসে। প্রভাত নাকি মাঝে মাঝে তাকে শাড়িও পাঠায়। শাঁখা সিঁদুর দেশে ফিরে এলে দেবে।

আর নারী তার দেহ মন লয়ে শঙ্করের কাছ থেকে বহুদূরে সরে রয়েছে। তাদের ব্যবধান শুধু সাত সমুদ্র তের নদীর নয়, এক গ্রহ থেকে আর এক গ্রহের। তার কাছে নারী নির্বিশেষে এক সাধারণ সত্তা; বিশেষ কেউ নেই, নির্দিষ্টা উদ্দিষ্টা কেউ নেই। ট্রামে বাসে রাস্তার মোড়ে পার্কে, কলেজে ইউনিভার্সিটির সামনে সেই সত্তা বিশ্বময় ছড়িয়ে রয়েছে কিন্তু বিশেষ একটি মূর্তি নিয়ে কেউ তার কাছে আসছে না, কাউকে শঙ্কর তার কাছে একান্ত করে টানতে পারেনি। বাপ মা অনেক দিন মারা গেছেন। ভাইবোন কেউ নেই। দূর সম্পর্কের আত্মীয়স্বজন যাঁরা আছেন তাঁদের নৈকট্যের জন্যে শঙ্করের মনে কোন আগ্রহ নেই। স্বচ্ছল সম্পন্ন স্বজন বন্ধুদের কাছে শুধু অনুকম্পা কুড়িয়ে লাভ কি। তার চেয়ে নিজের মেসের ঘরের নিঃসঙ্গতা অনেক নিবিড় এবং অকৃত্রিম, হোটেলের ভাত তরকারি রাজভোগের মত উপভোগ্য।

পারতপক্ষে কোন সামাজিক নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণে যায় না শঙ্কর। অসুখ-বিসুখ কি অন্য কোন কাজকর্মের অজুহাতে এড়িয়ে যায়। তবু মাঝে মাঝে তাকে নিয়ে টানাটানি চলে। তার নিজের জন্যে নয়, তার ক্যামেরাটির জন্যে। মোটামুটি ভালো ফোটো তুলতে পারে বলে একটু খ্যাতি আছে শঙ্করের। দু-একটা প্রদর্শনীতে কি পত্র-পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় তার তোলা ছবি সমাদৃত হয়েছে। আয়নায় নিজের মুখ দেখার মত নিজের এবং আত্মীয় বন্ধুর প্রতিকৃতি দেখার যে প্রচণ্ড সাধ আছে, মানুষের সেই সাধই তাকে সমাজে যা একটু সম্মান দিয়েছে। আর তার ফলেই পরিচিত বন্ধু বান্ধব কি তাদের

আত্মীয়-বন্ধুদের বাড়িতে মাঝে মাঝে ডাক পড়ে শঙ্করের। বিয়েতে, অন্নপ্রাশনে, জন্মদিনে, শ্মশানে, শ্রাদ্ধবাসরে কি বিবাহবার্ষিকীতে এই ক্যামেরাই সমাজজীবনের সঙ্গে মাঝে মাঝে শঙ্করের সংযোগসেতু হয়েছে। এখন আর তত উৎসাহ নেই। অনর্থক ফিল্ম নষ্ট। ফোটো তোলাটা শঙ্করের পেশা হলেও সব জায়গায় তা তো আর জাহির করে বলা যায় না। ফলে অন্যের শখ নিজের গাঁটের টাকায় মেটে। কেউ কেউ বলেন, 'কিছু ভাববেন না, আপনার ফিলমের দামটা নিশ্চয়ই দিয়ে দেব। তাতো আর আপনার ঘরে তৈরি হয় না।' কিন্তু অনেকেই শেষ পর্যন্ত নিজের প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে যান। আর এর জন্যে তশীলদারি করতে শঙ্করের বড় খারাপ লাগে।

এই ফোটো তোলবার জন্যেই প্রভাত তাকে পিকনিক পার্টিতে নিয়ে এসেছে। পার্টির যারা সদস্য তাদের দশ টাকা করে চাঁদা। যারা এখনো হাফ প্যান্ট ফ্রক পরে তাদের পাঁচ টাকা। কিন্তু প্রভাত বলেছে, 'তোমাকে ওসব নিয়ে ভাবতে হবে না। তুমি আমাদের দুচারখানা ফোটো তুলে দেবে তাহলেই চলবে। হৈ চৈ করতে করতে দিনটা বেশ চমৎকার কাটবে। বাগানবাড়ি গঙ্গার ধার, মাঝে মাঝে দুএকটি অচেনা তরুণীব মুখ, দু'একটি মধুরকণ্ঠ জীবনে নতুন স্বাদ এনে দেবে। তুমি যদি আর একটু চড়া রকমের আমোদ ফুর্তি চাও সে ব্যবস্থাও আছে। তাস খেলতে তুমি তো ভালোবাস। পাঁচ সাত জোড়া তাস অন্তত যাচ্ছে। আমাদের দলে পাকা খেলোয়াড় আছে। শুধু পুরুষ না মেয়েরাও খেলবেন। তুমি স্টেকেও খেলতে পার। তবে তোমার বোধহয় হৃদয় ছাড়া আর কিছুই হারাবার নেই। বিদ্যা যেমন যতই দান কর ততই বেড়ে যায়, হৃদয়ের বেলাতেও তেমনি। যতই হারাবে ততই ফিরে পাবে।'

শঙ্কর বলেছিল, 'সে ভরসা তোমার আছে। তুমি রূপবান বিত্তবান পুরুষ। তোমার হৃদয়টা বড়শি। তা জলে ফেললেই বড় বড় রুই কাতলা উঠে আসবে। কিন্তু আমার মত নিঃস্ব শ্রীহীন বিদ্যাবুদ্ধিহীন মানুষের হৃদয় ভিতরে ভিতরে মাখনের মত নরম হলেও দেখতে তো

একটা পাথরের নুড়ির মত। জলে যদি একবার পড়ে কোথায় যে তলিয়ে যাবে তার আর কোন চিহ্ন থাকবে না। আমাদের হৃদয় হারানো মানে একেবারেই সর্বস্বান্ত হওয়া। একটি কানা-কড়িও ফিরে পাওয়ার প্রত্যাশা নেই।'

প্রভাত জবাব দিয়েছিল, 'তুমি একটি আস্ত বোকা। হৃদয় যে তোমার ছিল তা তুমি তখনই টের পাও যখন তা হারাও। আমি সেই পাওয়ার কথা বলছি। হৃদয় হারিয়ে আমরা আমাদের অস্তিত্বকে টের পাই। তাই আমি ও-বস্তু হারাবার জন্যে সব সময় তৈরি হয়ে বসে থাকি।'

সুখী মানুষের মুখে কখনো কথার অভাব হয় না। কিন্তু হাহাকারই দুঃখের একমাত্র ভাষা।

আস্তে আস্তে দু-চার পা করে এগোতে লাগল শঙ্কর। এই পোড়ো বাগানবাড়িতে সত্যিই যেন হঠাৎ এক রঙীন পাখি আর প্রজাপতি এসে পাখা মেলে দিয়েছে।

' একদল কিশোরী মেয়ে আলাদা আলাদা জোড় বেঁধে কি যেন খেলছে। কতকগুলি ফুলের নাম তাদের মুখে শোনা গেল। বোধ হয় ফুল মেলানোর খেলা। এক একজন এক একটি ফুল হয়েছে।

আর এক পাশে একটি ছেলের চোখ বেঁধে দেওয়া হয়েছে। তাকে কে যেন মাথায় ঠোক্কর দিয়ে গেছে। সে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে এক একজনের গায়ে তার হাত পড়ছে কিন্তু কিছুতেই তার নামটা সে ঠিক করে বলতে পারছে না।

ছেলেটি দেখতে বেশ সুন্দর হলেও বোধ হয় তত চালাক চতুর নয়। ওকে অনেকক্ষণ ভুগতে হবে।

'তোমরা ছায়ায় এসো, ছায়ায় এসে খেলো। এই রোদের মধ্যে তোমাদের অসুখ করবে। এই মিণ্টু চলে আয়। তুই;তো সেদিন জ্বর থেকে উঠেছিস। এই পিণ্টু।'

শঙ্কর মুখ ফিরিয়ে দেখল বড় কাঁঠাল-গাছটার গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে এক বুড়ো ভদ্রলোক বসে আছেন। তিনিই মাঝে মাঝে সাবধান

করে দিচ্ছেন ছেলেদের। তাঁর সব চুল পাকা। দু-চারটি ছাড়া দাঁত সব গেছে। অনাবৃত দুটি হাঁটু দুদিক থেকে উপরের দিকে উঠেছে। নুয়েপড়া ভদ্রলোকের ছোট্ট মাথাটুকুর সঙ্গে যেন তাদের প্রতিযোগিতা।

তরুণ তরুণী কিশোর কিশোরীদের এই মেলায় বুড়ো কেন এসেছেন কে জানে। আজ কে তাঁর ধমক শুনবে? অনুরোধ উপরোধে কান দেবে? যে ছেলেটির চোখ বাঁধা তার নামই কি পিণ্টু? সে বোধ হয় আজ কানেও তুলো গুঁজে নিয়েছে।

শঙ্কর ক্যামেরা বার করে ফোটো তুলল, একটি ছেলেদের আর একটি মেয়েদেব, যারা ফুল মিলাবার খেলা খেলছে।

আর সঙ্গে সঙ্গে তারা খেলা ফেলে ছুটে এসে ফটোগ্রাফারকে ঘিরে ধরল।

'আমার একখানা ছবি তুলে দিন। আমার আলাদা একখানা ছবি তুলুন।'

পিণ্টু তার চোখের বাঁধন এতক্ষণে খুলে ফেলেছে।

ছেলেরা মেয়েরা দুদিক থেকে এসে শঙ্করকে বেড়াজালে ঘিরে ফেলল। তাবা আব আলাদা আলাদা নেই। ঘেঁষাঘেঁষি করে মিশে দাঁড়িয়েছে। যে যেখানে পারে জায়গা করে নিয়েছে। জামার রঙ কাবো নীল, কারো সবুজ, ফ্রকেব বঙ কারো হলদে কারো গোলাপী। মুখের রং কারো শ্যামলা কাবো গৌর। চোখের রঙ সকলেরই কালো। শঙ্কবের মনে হয় ফুলই বটে। তার দুপাশে দুটি শতদল ফুটেছে। পাপড়িগুলির রঙ কেবল আলাদা আলাদা।

শঙ্কর তাদের আর একখানি গ্রুপ ফোটো তুলল। কিন্তু তাতে কেউ খুশি নয়। প্রত্যেকেরই আলাদা ফোটো চাই। শঙ্কর তাদের ভরসা দিল, পরে তুলবে। খাওয়া-দাওয়ার পরে।

ছেলেরা আবার তাদের খেলায় ফিরে গেল। কিন্তু খেলাটা এবার আর তেমন জমে উঠছে না। পিণ্টু আর চোর হতে রাজী নয়। আর একজন কেউ চোর হোক।

পুকুরের ধারে কাঁঠাল গাছের ছায়ায় মাতুর বিছিয়ে জোর তাসের আসর বসেছে। ফোটো তোলার হৈচৈ-তে খেলোয়াড়দের বিন্দুমাত্র ধ্যান ভাঙ্গেনি।

একজন ভদ্রলোক নিজে থেকেই শঙ্করকে ডাকলেন, 'আরে আসুন না মশাই এদিকে। প্রভাত বলছিল আপনি নাকি খুব ভালো খেলতে জানেন। আসুন এসে বসে যান।'

কিন্তু শঙ্কর ওদিকে ঘেঁষল না। একটু দূরে মেয়েদের গানের আসর বসেছে। সেদিকে তার চোখ পড়ল। আমন্ত্রণটা সেখান থেকেও আসতে শঙ্কর সেদিকেই এগিয়ে চলল। তা দেখে তাসের আসরের মোটা ভদ্রলোকটি মন্তব্য করলেন, 'দেখলে তো কানাই, উনি নতুন খেলা খেলতে চললেন। নিত্য তুমি খেল যাহা, নিত্য ভালো নহে তাহা, আমি যা খেলিতে বলি সে খেলা খেলাও হে।'

ছিপছিপে চেহারার কানাই হেসে জবাব দিল, 'দাদা ও-খেলাকে নতুন বলছেন কেন। শুধু ওই যা নামেই আদি ও-খেলা অনাদি কাল ধরে চলছে—অনন্ত কাল ধরে চলবে।'

শুনতে শুনতে মৃদু হেসে এগিয়ে চলল শঙ্কর। খানিকটা দূরে একটি হারমোনিয়াম ঘিরে পাঁচ-ছটি মেয়ে জড়ো হয়ে বসেছে। শঙ্কর লক্ষ্য করল তাদের মধ্যে পদ্মা, কুমকুম আর ছায়াও আছে। আর যারা তারা অপরিচিতা। কিন্তু ওই তিনজনের সঙ্গেই বা শঙ্করের কতটুকু পরিচয়। চেনা-অচেনার কথা মনে পড়ায় শঙ্কর নিজেই একটু হাসল।

দলের মধ্যে প্রভাতও আছে; সেই ডেকে নিল শঙ্করকে। বলল 'এসো হে ফটোগ্রাফার এসো। এখানে তুলে রাখবার মত অনেক মুখ আছে।'

পদ্মা বলল, 'আপনি সুপারিশ করলে হবে কি প্রভাতদা, আপনার বন্ধুর মন উঠছে না। উনি কতজনের ফোটো তুললেন কিন্তু আমাদের দিকে একবার ফিরেও তাকালেন না।'

সাতাশ আঠাশ বছরের আর একটি যুবক বলে উঠল, 'তাকাবার সময় হলেই তাকাবেন। আমাদের যে তাকিয়ে তাকিয়ে ঘাড়ে ব্যথা

হয়ে গেল, কই তার জন্যে তো তোমার একটুও সহানুভূতি দেখছি না পদ্মা।'

পদ্মা বলল, 'থাক মন্টুদা, থাক, তোমার আর বাড়াবাড়ি করতে হবে না। অত করে বললাম তোমার ক্যামেরাটা নিয়ে এসো। তা গ্রাহ্যই করলে না। বিয়ের পর তুমি যেন কেমন হয়ে গেছ মন্টুদা।'

মন্টু এই অভিযোগ স্বীকার করে নিয়ে বলল, 'ঠিক বলেছ। বিয়ের পর আমি স্ত্রী ছাড়া আর কারো মুখের দিকে তাকাইনে। এমন কি ক্যামেরার ভিতর দিয়েও না।'

একথায় সবাই হেসে উঠল। শঙ্কর লক্ষ্য করল ছায়া লুকিয়ে লুকিয়ে হাসছে। দাঁতগুলি বড় সুন্দর তো মেয়েটির। হাসলে বেশ দেখায়।

প্রভাত বলল, 'গানটা তাহলে বন্ধই হয়ে গেল তোমাদের।'

কুমকুম বলল, 'হবে না বন্ধ। মন্টুবাবু যা আরম্ভ করেছেন! ওর সামনে কে গাইছে?'

পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বছরের আর একটি মহিলা বললেন, 'সত্যি মন্টু, তোমার জন্যে আমাদের গান শোনাটাই হ'ল না। ছায়া তুমি একখানা গাও না। রবীন্দ্রসঙ্গীত তুমি তো বেশ ভালো গাইতে পার।'

ছায়া অনুনয়ের সুরে বলল, 'না বউদি, আজ আমাকে মাফ করুন।'

মহিলাটি বললেন, 'আজ মাফ করলে কাল তোমাকে কোথায় পাব। তুমি কি আর বাড়ি থেকে কোথাও বেরোও। পিকনিক পার্টির বহু ভাগ্য তোমার মত অসূর্যম্পশ্যাকেও ধরে এনেছে।'

ছায়া বলল, 'বেরোতে ইচ্ছা কি আর করে না? সময় পাইনে বউদি। বাবা তো কেবলই ভোগেন। তারপর ভাইবোনগুলি যে কী দুরন্ত তাতো জানেনই। যদি একটু চোখের আড়াল হই—।'

মহিলাটি সহানুভূতির সঙ্গে বললেন, 'তা ঠিক। মাসীমা চলে যাওয়ার পর থেকে তুমিই তো সব আগলাচ্ছ। আমরা সবাই সেকথা বলাবলি করি। তোমার মত মেয়ে হয় না।'

ছায়া লজ্জিত হয়ে বলল, 'কী যে বলছেন বউদি !'

মণ্টু অধীর হয়ে উঠে বলল, 'এবার ঘর-সংসার রান্নাবান্নার কথা শুরু হবে। এই জন্যেই আমি মেয়েদের কাছে ঘেঁষতে চাইনে। তারা পিকনিকে এসেও রান্নাঘর আর আঁতুড়ঘরের কথা ভুলতে পারে না।'

কুমকুম বলল, 'একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না মণ্টুবাবু ?'

হারমোনিয়ামটা নিজের কোলের কাছে টেনে নিয়ে মণ্টু বলল, 'ওটা আপেক্ষিক। একজনের কাছে যা বাড়াবাড়ি আর একজনের কাছে তা নিতান্তই ছিঁটে-ফোঁটা। নায়িকাদের সাধাসাধি করে যখন কোন ফল হল না আমি নিজেই একটু গলা সাধি।'

সারে গামা পাধা নিসা নয়,—গলা সাধার নাম করে মণ্টু একেবারে রবীন্দ্রসঙ্গীত ধরে বসল, 'যদি তারে নাই চিনি গো—সে কি আমায় নেবে চিনে—।'

ইচ্ছা করেই গলাটা বিকৃত আর বেসুরো করে তুলল মণ্টু।

পদ্মার আর সহ্য হল না। সে হাত বাড়িয়ে মণ্টুর মুখ চেপে ধরে বলল, 'খবরদার, আপনি গুরুদেবের গান নিয়ে অমন ক্যারিকেচার করতে পারবেন না।'

মণ্টু আস্তে আস্তে পদ্মার হাতখানা সরিয়ে দিয়ে বলল, 'শুনেছি ভক্ত হয়ে ভজন করলে সাতজন্মে, আর শত্রু হয়ে ভজন করলে তিনজন্মে মুক্তি মেলে। একথার হাতে হাতে প্রমাণ পেলাম। আমার মুক্তি তিনজন্মে নয়, এক জন্মেই হয়ে গেল। অমন একখানা হাত যদি মুখের ওপর চাপা থাকে আমি সারা জীবন বোবা হয়ে কাটিয়ে দিতে পারি।'

অনেকেই হেসে উঠল। পদ্মার মুখখানা লজ্জায় টুকটুক করতে লাগল। 'অসভ্য' এই শব্দটি অস্ফুটভাবে উচ্চারণ করে আসর থেকে উঠে পড়ল পদ্মা।

কুমকুম আর ছায়াও উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু সেই মহিলাটি ওদের জোর করে ধরে রাখলেন। হেসে বললেন, 'তোমরা ভেব না, ওদের বিবাদ ওরা নিজেরাই মিটিয়ে নেবে।'

তারপর ছায়াকে ফের তিনি গান গাওয়ার জন্যে অনুরোধ করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত ছায়া মণ্টুর ছেড়ে দেওয়া গানখানিই তুলে নিল। 'যদি তারে নাই চিনি গো সে কি আমায় নেবে চিনে, এই নব ফাল্গুনের দিনে।'

এই বহুশ্রুত গান আর একবার মুগ্ধ হয়ে শুনল শঙ্কর। ভারি মিষ্টি সুরেলা গলাতো মেয়েটির। কণ্ঠ তো নয় যেন রুপার ঘণ্টা।

একখানা গান গেয়েই ছায়া থামতে চেয়েছিল কিন্তু শ্রোতারা তাকে থামতে দিল না। দ্বিতীয় গান 'রোদন ভরা এ বসন্ত।'

পিকনিক পার্টির পক্ষে এ গান নিশ্চয়ই উপযোগী নয়। কিন্তু শুনতে শুনতে সে কথা আর শঙ্করের মনে রইল না। গানটির কথায় সুরে একই সঙ্গে যে বাসনা বেদনার সংমিশ্রণ রয়েছে শঙ্কর শুনতে শুনতে তার সঙ্গে যেন একাত্ম হয়ে গেল।

খানিকক্ষণ বাদে গান থামলে যৌথ বউদি আবার ছায়াব পরিচয় দিতে শুরু করলেন, 'শুধু রেডিও আর রেকর্ড শুনে শুনে শিখেছে। এমন গলা, যদি তেমন সুযোগ সুবিধা পেতে—। কিন্তু সংসারই সামলাবে না আর কোন দিকে মন দেবে। বুড়ো বাপ আর আটটি ভাই-বোন সব ওর একাব ঘাড়ে। কোথাও কি ওর বেরোবাব জো আছে। যেটুকু অবসর পায় ঘবে বসে বসে বই পড়ে আর নিজের মনে গুন গুন করে। আজও আসতে চাইছিল না, আমরা জোর করে ধরে এনেছি তাই এল।'

ছায়া মুখ নিচু করে বলল, 'বউদি, ওসব থাক, ও সব কথা রাখুন।'

আরো দু'একটি মেয়েকে গাইবার জন্যে সাধাসাধি চলল, কিন্তু কেউ গাইতে রাজী না হওয়ায় গান বন্ধ হয়ে গল্প শুরু হল। বারাসতে গতবারের পিকনিক পার্টিতে কি রকম মজা হয়েছিল, এক ভদ্রলোক সেই গল্প জুড়ে বসলেন।

মাসীমারা রান্নাঘরে কী করছেন দেখে আসি বলে ছায়া উঠে পড়ল। কুমকুমও তার সঙ্গে গেল। শঙ্করেরও ইচ্ছা হল ওই সঙ্গেই

উঠে পড়ে। কিন্তু পাছে কেউ কিছু ভাবে তাই মিনিট পাঁচেক চুপ চাপ সেখানে কাটিয়ে শঙ্কর গল্পের আসর থেকে আস্তে আস্তে সরে এল।

বেলা প্রায় বারটা বাজে। ফালগুনের শুরুতে বেশ কড়া রোদ উঠেছে। বসন্তের রম্যতার চেয়ে গ্রীষ্মের তাপই এখন বেশি। বাগানের যে জায়গাটা একেবারে খোলা, যেখানে ঘাস নেই দূর্বা নেই, সেখানটা মনে হচ্ছে শুষ্ক মরুভূমির মত। এখানে ওখানে ওয়েসিস অবশ্য আছে, যেমন গল্পের আসর তাসের আড্ডা। কিন্তু এই মুহূর্তে কোথাও যেতে ইচ্ছা করল না শঙ্করের। তার চেয়ে নিঃসঙ্গ থাকতেই তার ভালো লাগছে। নিঃসঙ্গই সে থাকে। ভিড়ের মধ্যেও সে একা।

পিকনিকের যা অবস্থা শোনা যাচ্ছে তাতে দুটোর আগে খাওয়া-দাওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। একটা ডাল, ভাজা, আর মাংস ভাত। তারপর চাটনি, দই মিষ্টি। শেষের দুটি পদ তো আর রাঁধতে হবে না। কলকাতা থেকে তা কিনেই নিয়ে আসা হয়েছে। তবু অপরাহ্নের আগে আজ মধ্যাহ্নভোজন হবে না। এত লোকের রান্না। সময় লাগবে বই কি। এগারটার আগে বোধ হয় হাঁড়িই চাপেনি। কেউ তো এখানে রাঁধতে খেতে আসেনি। সবাই বেড়াতে গল্প করতে, বন্ধুবান্ধব নিয়ে আড্ডা দিতে এসেছে। অন্য সব উদ্যোগ আয়োজন কারা করেছে শঙ্কর জানে না। প্রভাতের দুই মাসীমা এসেছেন। মেসোমশাইরাও নিশ্চয়ই এসে থাকবেন। শঙ্কর শুনেছে তাঁরাই এ যজ্ঞের কর্মকর্তা। করণ-কারক তাঁদেরই দুটি চাকর আর একটি বামুন। আর সবাই চাঁদা দিয়েই খালাস। শঙ্কর তো তাও দেয়নি। বাইরে হোটেল টোটেল থেকে কিছু খেয়ে চলে যাওয়াটাই বোধ হয় তার পক্ষে ভদ্রতা হবে। কিন্তু এ অঞ্চলে কোথায় হোটেল আছে তা সে জানে না। আছে কি না তাই বা কে জানে।

ঘুরতে ঘুরতে বাগানের ফটকের কাছে এসে দাঁড়াল শঙ্কর। দেউড়ি-দরোয়ান কেউ নেই। একটি পাল্লা বন্ধ হলেও আর একটি পাট খোলাই আছে। শঙ্কর তার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

অনেকক্ষণ হল সিগারেট ফুরিয়ে গেছে। কাছাকাছি নিশ্চয়ই কোন দোকান-পাট পাওয়া যাবে।

বাগানের বাইরেই রাস্তা। পুবে পশ্চিমে প্রসারিত। তুপাশের সারি সারি বাড়িগুলির দরজা বন্ধ। কোন একটা বাড়ি থেকে রান্নার গন্ধ ভেসে এল। কিন্তু কাছে পান-সিগারেটের দোকান চোখে পড়ল না। রাস্তা পার হয়ে আর একটা সরু গলিতে পড়তেই ফের তিনটি মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। পদ্মা কুমকুম আর ছায়া। দেখে অবশ্যই খুশি হল শঙ্কর। তাপদগ্ধ এই মরুভূমির মধ্যে একটি নয়, তুটি নয়, তিন তিনটি ওয়েসিস। কিন্তু একটি থাকলেই সব চেয়ে ভালো হত। প্রমীলা রাজ্য তো শঙ্কর চায় না। শুধু একটি প্রমীলাকেই চায়। কিন্তু আশ্চর্য মেয়েরা কি দল বেঁধে ছাড়া চলতে পারে না।

ওরা আরো কাছাকাছি এলে পদ্মাই প্রথমে জিজ্ঞাসা করল, 'একি আপনি এদিকে কোথায় যাচ্ছেন ?'

শঙ্কর বলল, 'সিগারেটের খোঁজে বেরিয়েছি। আপনারা ?'

পদ্মা বলল, 'আমরা কিছুর খোঁজে বেরোইনি। বলতে পারেন নিখোঁজ হওয়ার জন্যে বেরিয়েছিলাম।'

শঙ্কর হেসে বলল, 'বেশ তো। তাহলে এত তাড়াতাড়ি ফিরে যাচ্ছেন যে ? হারাবার মত জায়গা পেলেন না !'

পদ্মা হেসে বলল, 'কই আর পেলাম ? পৃথিবীটাকে মানুষ একেবারে গৃহস্থবাড়ির উঠানের মত করে ফেলেছে। কোথাও আর কোন রহস্য নেই।'

শঙ্কর বলল, 'চলুন আর একটু খুঁজে দেখা যাক গুহা-গহ্বর কোথাও আছে কি না। চলুন আর একটু ঘুরে আসি।'

কথাটা পদ্মাকে বলে শঙ্কর ছায়ার দিকে তাকাল। ছায়া সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামিয়ে নিল। শান্ত স্নিগ্ধ তুটি চোখ সরু টানা তুটি ভ্রু যেন তুলি দিয়ে আঁকা।

ওর কাছ থেকে কোন জবাব না পেয়ে শঙ্কর কুমকুমকে জিজ্ঞাসা করল, 'যাবেন তো ?'

কুমকুম বলল, 'যেতে পারি তবে একটি শর্তে। আপনি আমাদের ফোটো তুলে দেবেন। প্রথমে একখানা গ্রুপ, তার পরে আলাদা আলাদা।'

শঙ্কর সঙ্গে সঙ্গে শর্তটা মেনে নিয়ে বলল, 'নিশ্চয়ই দেব।'

পদ্মা বলল, 'চলুন, সামনে আমরা আর একটা বাগান দেখে এসেছি। সেকেলে বাগান নয়, হাল-আমলের বাগান। নতুন একটা বাড়ি উঠছে, এখনো শেষ হয়নি, পুকুরটুকুর সব আছে। ব্যাকগ্রাউণ্ডটা বেশ হবে।'

শঙ্কর বলল, 'চলুন, আপনার যখন চেনা জায়গা আপনিই পুরোবর্তিনী হন।'

পথের দুদিকে একতলা ছোট ছোট পুরনো বাড়ি। এই ভর দুপুরে কোথাও কোন সাড়া শব্দ নেই। সবাই বোধ হয় খেয়ে দেয়ে ঘুমুচ্ছে। পথেও লোকজন দেখা যায় না।

ছায়াকে এক সময় নিজের পাশে দেখে শঙ্কর বলল, 'এই রোদে আপনার বোধ হয় খুব কষ্ট হচ্ছে।'

ছায়া ক্ষীণ প্রতিবাদের সুরে বলল, 'না না'।

শঙ্কর বলল, 'আপনার গান দুখানি আমার খুব ভালো লাগল। দুটিই আমার খুব প্রিয় গান।'

ছায়া তেমনি মৃদু স্বরে বলল, 'হয়তো সেই জন্যেই আপনার অত ভালো লেগেছে।'

শঙ্কর বলল, 'তা কেন। 'আপনি গেয়েছেনও খুব ভালো।'

পদ্মা পিছন ফিরে তাকিয়ে একটু বিশেষ ভঙ্গিতে হাসল, 'শঙ্করবাবু, এ সব কি ভালো হচ্ছে?'

শঙ্কর বলল, 'কোন সব?'

পদ্মা বলল, 'আমাদের তিনজনকে ডেকে এনে একজনের সঙ্গে অমন গুন গুন করা? আমরা গান গাইতে পারিনে বলে কি গুন গুন করতেও জানিনে?'

শঙ্কর বলল, আপনার সেই গুনগুনটুকু তা হলে নিশ্চয়ই শোনাবেন।'

পদ্মা বলল, 'কোন লাভ নেই। ছায়া আজ বাজার মাত করে রেখেছে। রান্নাবান্নার দেরি দেখে আমার স্বামী চলে গেছেন ব্যারাকপুর। বলে গেছেন খানিকক্ষণের জন্যে তুমি অনাথা হলেও একেবারে নির্বান্ধব হবে না। কিন্তু এখানকার রকম সকম দেখে এখন ভাবছি তার সঙ্গে চলে গেলেই পারতাম।'

কুমকুম হেসে বলল, 'যেতে চাইলেই তুমি পারতে কি না? প্রণববাবুর বুঝি আর সেখানে কেউ নেই? এই রোদে তিনি বুঝি মিছিমিছিই সেখানে ছুটেছেন?'

পদ্মা হতাশার ভঙ্গি করে বলল, 'ঠিক বলেছ, আমার একূলও গেল ওকূলও গেল।

বাঁদিকে একটা মজা পুকুর। পানায় ভরতি। ধার থেকে বোলে ভরা একটা আমগাছ হেলে পড়েছে। মোড় ঘুরে পূবমুখী হতে রাস্তাটা আরো চওড়া হল। এবার শুধু দুজনে নয় তিনজনেই পাশাপাশি চলা যায়।

পদ্মার ঠাট্টার ভয়ে ছায়া শঙ্করের পাশ থেকে সরে গেছে। কুমকুম চলছে তার সঙ্গে সঙ্গে। ফর্সা, একটু বেঁটে ধরনের চেহারা। নাকটা তিলফুলকে জয় করতে না পারলেও একেবারে খাঁদাও নয়। সব মিলিয়ে দেখতে মোটামুটি সুশ্রী পদ্মার মত প্রগলভা নয়, আবার ছায়ার মত মৌনব্রত নিয়েও বসেনি। সব দিক থেকেই মধ্যবর্তিনী।

বাঁদিকে সারি সারি কয়েকটি বাড়ি। হঠাৎ কুমকুম বলে উঠল, 'ওই যে সেই পোষ্ট অফিসটা।'

একটি টিনের ঘরের মাথার উপর পোষ্ট অফিসের সাইন বোর্ড এঁটে দেওয়া হয়েছে। দরজা তালাবন্ধ। তার পাশে লালরঙের চিঠির বাক্স।

কুমকুম বলল, 'জানেন এ রকম অচেনা সব জায়গায় এ ধরনের পোষ্ট অফিস দেখলে আমার মনটা যেন কেমন হয়ে যায়।'

শঙ্কর বলল, 'কি রকম?'

কুমকুম বলল, 'মনে হয় এই পোষ্ট অফিসের ছাপ নিয়ে কোন দিন আমার নামে চিঠি যাবে না। আমিও কোনদিন এই বাক্সে

চিঠি ফেলব না। এ পোষ্ট অফিস শুধু আমার দেখবার জন্যে, ব্যবহার করবার জন্যে নয়।'

শঙ্কর এবার কি জবাব দেবে ভেবে পেল না। তবে কুমকুমের বলবার ভঙ্গিটুকু তার মনকে স্পর্শ করল।

পদ্মা হেসে বলল, 'জানেন আমাদের কুমকুম বাড়িতে ফিরে গিয়ে নিশ্চয়ই এই নিয়ে একটা কবিতা লিখে ফেলবে।'

শঙ্কর বলল, 'উনি কবিতা লিখতে জানেন নাকি ?'

পদ্মা বলল, 'জানে আবার না ? কলেজের ফার্স্ট ইয়ার থেকে ও কবিতা লেখে। আর মফঃস্বলে এসে পোষ্ট অফিস দেখলেই ওর মন উদাস হয়ে যায়। অল্প বয়সে নিশ্চয়ই গাঁয়ের কোন পোষ্টমাষ্টারকে ভালোবেসে ছিল। এখন container for the content.'

কুমকুম বাধা দিয়ে বলল, 'যাঃ।'

পদ্মা বলল, 'এখানে কেউ কবি, কেউ গায়িকা—।'

শঙ্কর হেসে বলল, 'আর আপনি সাক্ষাৎ কথাশিল্পী।'

ডান দিকে আর একটা বাগানবাড়ি। বাড়িটা এখনো সম্পূর্ণ হয়নি। এ বাড়িরও ফটক খোলা। তরুণ বয়সী মালীকে বেশি অনুরোধ করতে হল না। মেয়েদের দেখে সে নিজের গরজেই পথ ছেড়ে দিল এবং আর কিছু কাজ করে দেওয়ার জন্যে উৎসুক হয়ে রইল।

সুরকি ঢালা পথের দু দিকে মরসুমী ফুলের কেয়ারী। মাঝে মাঝে লাল আর সাদা গোলাপ। এখানেও পূব দিকে পুকুর। নতুন কাটা হয়েছে। নতুন বাঁধানো ঘাট। স্বচ্ছ জল তীব্র রোদে ইস্পাতের মত ঝক ঝক করছে। দক্ষিণে ছায়াঘন নারকেলের সারি।

পদ্মা সেদিকে তাকিয়ে বলল, 'নিন, এবার টপ টপ করে কয়েকটা ফোটো তুলে নিন। আমরা অনেকক্ষণ এসেছি। আমাদের না পেয়ে পিকনিক পার্টির কর্তারা হয়তো থানায় ডায়েরী করতে ছুটেছেন—একটি ফোটোগ্রাফারের সঙ্গে তিনটি তরুণী উধাও। বেশি দেরি করবে না। শেষে হাতকড়া পড়ে যাবে।'

শঙ্কর হেসে বলল, 'তবু তো কিছু পড়ুক।'

এত রোদে ফোটো তোলা যায় না। তাই খানিকটা ছায়ার সন্ধান করতে হল।

বাড়িটার আড়ালে ওদের পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে ক্যামেরা নিয়ে শঙ্কর সরে আসছে। পদ্মা বলে উঠল, 'কি রকম মানুষ আপনি। এত ফুল থাকতে আমরা বুঝি খালি হাতে ফোটো তুলব?'

শঙ্কর বলল, 'আমি ভেবেছিলাম ফুলদের আর ফুল দিয়ে কী সাজাব।'

এর পর মালীকে ডেকে শঙ্কর কিছু ফুল আনতে বলল, মালীর বুদ্ধি আছে। তিনটি তোড়া ছাড়াও তিনটি রক্তগোলাপ নিয়ে এসেছে।

শঙ্কর বলল, 'তোড়াটি হাতে আর গোলাপটি মাথে—ঠিক করে পরে নিন।'

ছায়া হঠাৎ বেঁকে বসল, 'পদ্মাদি আপনারা ফোটো তুলুন। আমার তুলে কাজ নেই।'

কুমকুম বলল, 'কেন, তোমার আবার কী হল।'

ছায়া বলল, 'আমার ছবি ভালো হয় না। ভারি বিশ্রী হয়।'

পদ্মা বলল, 'শঙ্করবাবুর হাতে মোটেই বিশ্রী হবে না। উনি এমন করে ছবি তুলে দেবেন যে ফোটো দেখেই বরপক্ষ দিশেহারা হয়ে ছুটে আসবে।'

হাতে ফুলের তোড়া, খোঁপায় গোলাপ ফুল গুঁজে তিন জনে তৈরি হয়ে দাঁড়াল। ছায়ার ফুলটা মাটিতে পড়ে যেতে পদ্মা হেসে বলল, 'দেখলেন তো। আপনি পরিয়ে না দিলে ওর ফুল কিছুতেই খোঁপায় থাকতে চাইছে না।'

ছায়া চাপা গলায় মৃদু ধমকের সুরে বলল, 'ছিঃ কী হচ্ছে পদ্মাদি।'

শঙ্কর পাছে সত্যিই ফুলটা পরিয়ে দিতে আসে সেই ভয়ে ছায়া তাড়াতাড়ি নিজেই আবার ফুলটা গুঁজে নিল।

খানিকটা দূরে এসে শঙ্কর এবার ক্যামেরাটা ঠিক করে নিতে গিয়ে টের পেল আর ফিল্ম নেই। আসার সময় নতুন করে ফিল্ম আর কিনে নিয়ে আসেনি। ভেবেছিল যা দু চারখানা আছে তাতেই চলে যাবে। অনর্থক পয়সা খরচ করে কী হবে। এর আগে শঙ্করের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে দেখেছে এ সব ফোটো কেউ আর টাকা খরচ করে নেয় না। হয় বিলিয়ে দিতে হয় না হয় ঘরেই পড়ে থাকে। তার শ্রম আর অর্থ মিছিমিছি নষ্ট হয়।

কিন্তু এমন একটি চমৎকার মুহূর্তে এসে তার সব ফিল্ম ফুরিয়ে যাবে শঙ্কর তেমন আশঙ্কা করেনি। এক মুহূর্তে সে স্তব্ধ হয়ে রইল। কথাটা যদি প্রকাশ করে তাহলে ওরা হতাশ হয়ে পড়বে। হয়তো ভাববে ফিল্ম নেই জেনেও ফোটো তোলার নাম করে সান্নিধ্যের লোভে শঙ্কর ওদের ডেকে নিয়ে এসেছে। এর চেয়েও বেশি খারাপ ধারণা করা অসম্ভব নয়। তাতে লাভ কি হবে। একটি সুন্দর গানের সুর শুধু মিছিমিছি কেটে যাবে। তার চেয়ে একটি মধুর মিথ্যায় এই মুহূর্তটি মধুরতর করে রাখা ঢের ভালো।

শঙ্কর নিজেকে সামলে নিয়ে হেসে বলল, 'রেডি ?'

পদ্মা বলল, 'অনেকক্ষণ।'

তারপর শঙ্কর ওদের ফোটো তুলে নিল।

গ্রুপ শেষ হলে প্রত্যেকের আলাদা আলাদা। তাও একখানা করে নয়। বসিয়ে রেখে দাঁড় করিয়ে নানাভাবে ওদের ফোটো তুলল শঙ্কর। এখন আর তার কোন ভয় নেই। এখন পুরোমাত্রায় তার সাহস বেড়ে গেছে।

ফোটো তোলার পর্ব শেষ হলে মালীকে কিছু বকশিশ দিয়ে শঙ্কর ওদের নিয়ে বাগান থেকে বেরিয়ে পড়ল।

ছায়া শঙ্করের পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে মৃদুস্বরে বলল, 'আমার ফোটো আপনাকে পাঠাতে হবে না।'

শঙ্কর বলল, 'কেন ?'

'আমার ফোটোগুলি আপনার কাছেই রেখে দেবেন !'

'আপনার ফোটো ভালো উঠবে না এই ভয়ে বলছেন?'

ছায়া বলল, 'না, এমনিই।'

পদ্মা আর কুমকুম আগে আগে যাচ্ছিল।

একবার মুখ ফিরিয়ে হেসে বলল, 'শঙ্করবাবু, ফের পক্ষপাত ছায়াকে বাড়ি পর্যন্ত এখন নিয়ে যেতে পারলে হয়।'

রোদের তাপ বেড়েছে বলে পদ্মা আর কুমকুম দুজনে মাথায় আঁচল তুলে দিল।

শঙ্কর বলল, 'আপনিও আঁচল দিন মাথায়।'

ছায়া বলল, 'না না না, আমার লাগবে না।'

শঙ্কর পকেট থেকে রুমালটা তুলে নিয়ে বলল, 'তাহলে এইটা মাথায় বাঁধুন।'

ছায়া এবার হেসে বলল,' সে বড় বিশ্রী দেখাবে।'

শঙ্কর তখন রুমালটা পকেটে রেখে ছায়ার আঁচলটাই তার মাথায় তুলে দিল।

ছায়া আড়ষ্ট হয়ে মৃদু তিরস্কারের সুরে বলল, 'কী যে করছেন। কেউ যদি দেখে ফেলত।'

রাজাদের বাগানবাড়িতে শঙ্কররা যখন ফিরল তখনও সব রান্না নামেনি। প্রভাত তাসের আড্ডায় ভিড়ে পড়েছে। মন্টুর চার পাশে ছেলেমেয়েরা জড়ো হয়েছে। সে এক বার শিশির ভাদুড়ী আর অহীন্দ্র চৌধুরী আর একবার নরেশ মিত্র এবং সর্বশেষে সরযূবালার গলার অনুকরণ করে অভিনয় করেছে। মেয়েরা ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলে হেসে লুটিয়ে পড়ছে। তাদের মায়েরা মুখে আঁচল গুঁজে কোন রকমে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। এখন মন্টুই এই পার্টির হিরো। কিন্তু সেজন্যে শঙ্করের মোটেই ঈর্ষা হল না।

আরো আধ ঘন্টা বাদে খাওয়ার ডাক পড়ল। ছেলেদের নয়, মেয়েদেরই আগে খাইয়ে দেওয়া হবে। তারপরে তারা পরিবেশন করবে। মেয়েদের দলে বাচ্চা ছেলেরাও পড়ল। সেই বুড়ো ভদ্রলোকেরও ওই দল-ভুক্ত হবার সৌভাগ্য ঘটাল। শোনা গেল

আরো একটা আইটেম বেড়েছে। প্রভাতের ছোট মেসোমশাই গঙ্গার মাঝিদের কাছ থেকে একেবারে টাটকা দুটি ইলিশ মাছ কিনে নিয়েছেন।

মেয়েদের খাওয়া শেষ হলে পুরুষদের ডাক পড়ল। ঘরের সামনের দিকের দালানে দুই সারিতে খান পঞ্চাশেক পাতা পড়েছে। কলারপাতা, মাটির গ্লাস, বসবার জন্যে কারো খবরের কাগজ কারো নিজের রুমাল। কেউ বা বিনা পিঁড়িতেই আসনপিঁড়ি হয়ে বসলেন।

আশেপাশে সামনে যাঁরা বসেছেন কাউকেই চেনে না শঙ্কর। দু চারজনের সঙ্গে এখানে যা এক আধটু পরিচয় হয়েছে। হোটেলেও এমনি অপরিচিতদের সঙ্গে শঙ্কর রোজ দুবেলা খায়। কিন্তু আজকে খাওয়ার স্বাদ আলাদা।

প্রভাত বসেছে একটু দূরে। সে সেখান থেকে চেঁচিয়ে বলল, 'শঙ্কর, মেয়েরা যখন খাচ্ছিল, তুমি তাদের একটা ফোটো নিয়েছ তো?'

তার পাশ থেকে আর এক ভদ্রলোক বললেন, 'ওকে আর শিখিয়ে দিতে হবে না। উনি কেবল মেয়েদের ফোটো নেওয়ার জন্যেই এখানে এসেছেন।'

মন্টু সামনের সারি থেকে মেয়েলী গলায় বলল, 'আমার নাম মন্টুরানী। দয়া করে আমারও একটা ফোটো নেবেন শঙ্করবাবু।' অনেকেই হেসে উঠল।

পাশের এক ভদ্রলোক বিরক্ত হয়ে বললেন, 'নাঃ কী যে শুরু করেছ মন্টু। তোমার জ্বালায় সবাই আমরা বিষম খেয়ে মরব।'

মন্টু বলল, 'আগে ভাত আসুক তবে তো বিষম খাবেন। কলাপাতা সামনে নিয়ে আমি তো শুধু ক্ষিদেয় খাবি খাচ্ছি।'

ভাত তরকারি সবই এল। নানা বয়সের তিন চারটি মহিলা পরিবেশনের ভার নিয়েছেন। শঙ্কর দেখে খুশি হল তাঁদের মধ্যে ছায়াও আছে। কোমরে আঁচল জড়ানো, হাতে ভাতের থালা। ভারি চমৎকার মানিয়েছে ওকে, বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। শঙ্করের ফিল্ম থাকলে সত্যিই একখানা ফোটো তুলে নিত।

প্রথমবার ছায়া শঙ্করকে পরিবেশন করতে এল না অন্য দিক দিয়ে ঘুরে গেল। দ্বিতীয়বার এল ফিরতি ভাত নিয়ে।

শঙ্কর বলল, 'আমার আর লাগবে না।'

ছায়া তবু সাদা ফুলের মত এক হাতা গরম ভাত শঙ্করের পাতে ঢেলে দিয়ে মৃদু স্বরে বলল, 'আপনি তো কিছুই খাচ্ছেন না। সবই যে পড়ে রইল।'

এই কথা কটি তো আর সুর দিয়ে বলেনি ছায়া, তবু যেন সুরের ধারা গলে পড়ল। শঙ্করের মনে হল, অনেক কাল অনেক যুগ বাদে অন্নের সঙ্গে সুধাকণ্ঠের, একটি অন্তরের স্নিগ্ধ মাধুর্যের সংযোগ ঘটল তার ভাগ্যে।

ডানদিকে দু তিনখানা আসন পরে দীর্ঘকায় স্বাস্থ্যবান এক ভদ্রলোক খাচ্ছিলেন। সবাই তাঁকে খাওয়াবার জন্যে ব্যস্ত। 'দিলীপবাবুকে দাও, দিলীপবাবুকে দাও। যিনি খেতে পারেন তাকে দাও। যিনি খেতে পারেন তাকে খাওয়াও।'

আর এক ভদ্রলোক বললেন, 'হ্যাঁ আর্টিস্ট বটে আমাদের দিলীপবাবু। পুরুষের মত খান, পুরুষের মত বাঁচেন, পুরুষকে নিয়ে ছবি আঁকেন। বসে বসে কাঁঠাল গাছটার কেমন স্কেচ এঁকেছেন দেখেছ? আর প্রভাতের বুড়ো মেসমশাইর? চমৎকার হয়েছে। লতা পাতা নয়, ওঁর 'সাবজেক্ট শাল তাল, তমাল, বট অশ্বত্থ। সব বনস্পতি। আর মানুষের বেলায় সব পুরুষ। মেয়েদের ছবি এঁকে চোখ ভোলানো খুব সহজ। কিন্তু শক্তিমান রহস্যময় পুরুষকে যিনি আঁকতে পারেন তিনি সত্যিকারের আর্টিস্ট। ওঁর স্টুডিওতে গিয়েও দেখেছি কালী ছাড়া কোন মেয়ে নেই।'

মণ্টু খেতে খেতে মাংসের টুকরোটুকু পাতে নামিয়ে দাঁত দিয়ে জিভ কাটল, তারপর বলল, 'ছি ছি ছি তাঁকে আর মেয়ে বলবেন না।'

এঁটো ডান হাত আর বাঁ হাত মিলিয়ে কপালে ঠেকিয়ে বলল, 'তিনি মা। বাবা তাঁর কাছে কেঁচো।'

শঙ্কর বুঝতে পারল না এ সব আলোচনায় তার ওপর কটাক্ষ আছে কিনা। হয়তো আছে। কিন্তু শঙ্কর তা গ্রাহ্য করল না। ততক্ষণে সন্দেশের থালা নিয়ে ছায়া আবার তার পাতের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

শঙ্কর বলল, 'না না না, আমাকে মিষ্টি দেবেন না। মিষ্টি আমি খাইনে।'

ছায়া বলল, 'আপনি তাহলে কী খান।'

জোর করেই দুটি সন্দেশ তার পাতে দিয়ে গেল ছায়া। মৃদুকণ্ঠে বলল, 'মিষ্টি আজ খেতে হয়।'

শঙ্করের মনে হল এই কথাটুকু তৃতীয় সন্দেশ, কিন্তু স্বাদে সর্বোত্তম।

খাওয়াদাওয়ার পর খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে নিতে নিতে বেলা পড়ে এল। রোদ যে কখন গাছের আগডালে উঠে বসেছে কেউ খেয়াল করেনি।

কয়েকজন ফের গিয়ে তাসের আসরে বসলেন। কিন্তু আজ আর তাসে রুচি নেই শঙ্করের।

আশ্চর্য, পদ্মারা আর তার কাছে ঘেঁষছে না। মৃদু হেসে দূর দিয়ে চলে যাচ্ছে। শঙ্কর টের পেল মেয়ে মহলে ছায়াকে নিয়ে খুব হাসাহাসি চলছে। কে জানে পদ্মা আর কুমকুম কতখানি বানিয়ে বলেছে, কোন্ অসম্ভবকে বিশ্বাস্য করে তুলেছে কে জানে।

সন্ধ্যার আগে আগে দু'খানা ডিঙি নৌকো এলো ঘাটে। প্রভাতের ছোট মেসোমশাই শৌখিন মানুষ। তিনি এগিয়ে এসে শঙ্করের কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'চলুন গঙ্গার ওপরে বসে সূর্যাস্তের ছবি তুলবেন চলুন।'

শঙ্কর তাঁর অনুরোধ এড়াতে পারল না। মুখ ফুটে কিছুতেই বলতে পারল না তার ফিল্ম ফুরিয়ে গেছে। পাছে জেরায় জেরায় ধরা পড়ে যায়। কোন মুহূর্তে সে সর্বস্বান্ত হয়েছে পাছে সেই কথা উঠে পড়ে।

পার্টির লোকেরা তুই নৌকোয় ভাগ হয়ে গেল। একখানা নৌকো কাছাকাছি ঘুরবে। প্রত্যেকটি গ্রুপকে চান্স দেবে। কিন্তু ছোট মেসোমশাই তিনজন সহযাত্রী নিয়ে গঙ্গা পার হবার সঙ্কল্প করেছেন।

ঘাটের ভিড়ের মধ্যে শঙ্করের চোখ যাকে খুঁজল কিছুতেই তার সঙ্গে চোখাচোখি হল না। লজ্জায় কোথায় সে লুকিয়ে আছে কে জানে ?

ঘণ্টাখানেক গঙ্গার মধ্যে বেড়িয়ে বিনা ফিল্মে দশ বারখানা ছবি তুলবার অভিনয় করে শঙ্কর যখন ফিরল তখন সন্ধ্যা ঘোর হয়ে গেছে। নদীর ওপারে মিল এলাকা গুলিতে সারি সারি আলো জ্বলে উঠেছে। বিদ্যুতের বৈজয়ন্তীমালা। কিন্তু এপারে রাজাবাবুদের বাগানবাড়িতে কোন আলো নেই। এখানে ইলেকট্রিসিটি আসেনি। তু তিনটি টর্চ জোনাকির মত মাঝে মাঝে জ্বলছে নিভছে।

যে বাসটায় করে শঙ্কর এসেছিল সেই বাসটাই অন্ধকারে রাক্ষসের মত দাঁড়িয়ে আছে। খোলা দরজাটা মনে হচ্ছে তার মুখ গহ্বর। কোন্ এক মেয়েস্কুলের এই বাসটাকে পিকনিক পার্টি ভাড়া করে এনেছিল। একদল যাত্রীকে সে কলকাতায় পৌঁছে দিয়ে এসেছে দ্বিতীয় দল যাত্রার জন্যে উদ্যত।

প্রভাত বাসে উঠবার আগে বলল, 'আরে শঙ্কর। তুমি এখনো যেতে পারনি ?'

শঙ্কর বলল, 'না। মেয়েরা—পদ্মাদেবীরা কি চলে গেছেন ?'

প্রভাত বলল, 'অনেকক্ষণ। তাদের সবাইকে ফার্স্ট ট্রিপেই পাঠিয়ে দিয়েছি। ছায়া তো সেই বেলা চারটে থেকেই যাব যাব করছিল। রোগা বাপ আর তুষ্টু ভাইগুলিকে ফেলে এসেছে সেই চিন্তায় অস্থির। নাও উঠে বসো। বাসে আর জায়গা নেই। কষ্ট করে যেতে হবে।'

একটু চুপ করে থেকে শঙ্কর বলল, 'আমি একটু পরে যাব প্রভাত।'

প্রভাত বলল, 'সে কি। এইটাই যে লাস্ট ট্রিপ। বড় মেসোমশাইর যে গাড়িখানা ছিল তাও তো চলে গেছে। এর পর তুমি যাবে কি করে।'

শঙ্কর বলল, 'বি টি রোড পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে আমি একটা পাবলিক বাসে চলে যাবো।'

প্রভাত বলল, 'কেন এত কষ্ট করবে। একসঙ্গে গেলেই তো হতো।'

শঙ্কর বলল, 'না। আমার একটু দরকার আছে। একজনের সঙ্গে দেখা করে যেতে হবে।'

প্রভাত হেসে বলল, 'তাই বল। তোমার এখনো দেখা সাক্ষাৎ বাকি আছে।'

তারপর অন্ধকারে পুকুরের দিকে দু পা এগিয়ে গিয়ে বন্ধুর কাঁধে হাত রেখে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে প্রভাত বলল, 'তুমি না কি আজ এক আচ্ছা খেল দেখিয়ে দিয়েছ!'

শঙ্কর দুরুদুরু বুকে বলল, 'কি রকম।'

প্রভাত বলল, 'তুমি নাকি বিনা ফিল্মে, শ'খানেক ফোটো তুলেছ।'

শঙ্কর বলল, 'না না না। কে বললে।'

প্রভাত বলল, 'কে যেন বলছিল। তাই নিয়ে খুব হাসাহাসি। তুমি আমাদের মণ্টুকে হার মানিয়েছ। সাবাস। আচ্ছা তুমি তাহলে ধীরেসুস্থে দেখা সাক্ষাৎ সেরে এসো। আমরা এগোই।'

প্রভাত গিয়ে বাসে উঠল। ছোট মেসোমশাই আর তাঁর সঙ্গীরা আগেই গিয়ে উঠে বসেছেন।

একটু বাদেই বাসটা স্টার্ট নিল। তারপর চওড়া ফটক দিয়ে অন্ধকার বাগানের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল।

শঙ্কর অন্ধকারে সেই কাঁঠাল গাছের তলায় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। গাছটাকে এখন মনে হচ্ছে অতিকায় এক ভূতের মত। বাড়িটা ভূতুড়ে হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

দিনের বেলায় রাজাবাবুদের এই প্রায় পরিত্যক্ত বাড়ির ভিতরটা আরও কয়েকজনের সঙ্গে ঘুরে দেখেছিল শঙ্কর। ছোট-বড় অনেকগুলি ঘর। যে সব ঘর একদিন বিলাসকক্ষ ছিল তা আজ

পোকামাকড়ের বাসরঘর হয়েছে। বাড়ির খানিকটা গঙ্গা এরই মধ্যে ভেঙে নিয়েছে। আরো নেবে, সব নেবে। শতাব্দী জুড়ে রাজাবাবুদের কীর্তি কাহিনীভরা ইতিহাসের সঙ্গে একদিনের এই পিকনিক পার্টির ছোট্ট ইতিবৃত্তটুকুও কালস্রোতে কোথায় যে ভেসে যাবে তার কোন চিহ্নও আর থাকবে না।

কিন্তু সেই বন্যাস্রোতের আগেই কি সব শেষ হয়েছে? তার অনেক আগেই কি এক মধুর মুহূর্ত ভেঙে চূরমার হয়ে গেছে? যাওয়ার আগে ছায়া কি সব জেনে গেছে? বঞ্চক শঙ্করের স্বরূপ ধরা পড়ে গেছে তার কাছে?

কিন্তু তারা হাতে হাতে কোন প্রমাণতো পায়নি। কেউ তাকে হাতে হাতে ধরতে পারেনি। কাউকে সে নিজের ক্যামেরা ছুঁতে দেয়নি। তার ভাবভঙ্গি দেখে কেউ হয়তো অনুমান করে থাকবে। কিন্তু সেই শত্রুর কথা কি ছায়া বিশ্বাস করেছে? একটি মধুর মিথ্যার রঙীন ইন্দ্রজালের চেয়ে এক নিষ্ঠুর ক্রূর স্থূল সত্যকে পরম নির্ভরযোগ্য ভেবে বিদায় নিয়ে চলে গেছে ছায়া? সেইজন্যেই কি যাওয়ার আগে একবার দেখা করেও যায়নি, একটি কথা বল-বারও তার সাধ হয়নি?

হঠাৎ নিজেকে বড় রিক্ত আর নিঃসহায় বলে মনে হল শঙ্করের। এই বিপুল বিশ্বে তার আর কেউ নেই, কিছু নেই। সব পুড়িয়ে দিয়ে সে এক শ্মশানভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে। ওপরে নীচে চতুর্দিকে অন্ধকার ভরা অনন্ত শূন্যতা।

ঘুরেফিরে কখন একসময় আবার সেই রাজবাবুদের বাড়িতে এল শঙ্কর।

ছোট একটি হ্যারিকেন লণ্ঠন হাতে কে এসে সামনে দাঁড়াল। চমকে উঠল শঙ্কর। অস্ফুটস্বরে বলল, 'কে?'

স্ফুটতর কণ্ঠে প্রতিধ্বনি এল, 'কে? তুমি কে?'

তারপর একটু বাদেই নরম গলা শোনা গেল 'আমি মালী! আপনি ওই দলের মধ্যে ছিলেন না? আপনি যাননি? সবাই তো চলে গেছে!'

শঙ্কর বলল, 'ও। তাই বল। না, আমি যাইনি। তোমাদের বাগানটা একটু দেখছি।'

মালী বলল, 'দেখবার আর কিছু নেই বাবু। সে বাগানের আর কিছুই নেই।'

মালী তার কালিপড়া হ্যারিকেনটা উঁচু করে ধরল। পিকনিক পার্টির এঁটো কলাপাতা, ভাঙা মাটির গ্লাস আর কতকগুলি জঞ্জাল একধারে স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে আছে।

শঙ্কর বলল, 'তোমার নাম কি মালী?'

মালী হেসে বলল, 'আমার নাম কন্দর্প।'

শঙ্করও হাসল, 'কন্দর্প! বাঃ বেশ নাম।'

মনে মনে ভাবল মনসিজ শঙ্করের ভাগ্যে এক বৃদ্ধ মালী হয়ে দেখা দিয়েছে।

একটু চুপ করে থেকে শঙ্কর বলল, 'তুমি তোমার নামের মানে জানো কন্দর্প?'

মালী বলল, 'আজ্ঞে না বাবু।'

শঙ্কর বলল, 'তুমি হলে প্রেমের দেবতা। কোন দিন তুমি নিজে প্রেমে পড়েছ?'

বুড়ো মালী লজ্জিত হয়ে জিভ কাটল, 'না বাবু। আমি গরীব মানুষ। ও সব আপনাদের জন্যে।'

শঙ্কর বলল, 'তোমার এই বাগান আমার খুব ভালো লেগেছে। বাড়িটাও বেশ ভালো।'

মালী আরো কাছে এগিয়ে এসে নিচু গলায় বলল, 'আপনার কেউ আছে নাকি? আসতে চান!'

শঙ্কর বলল, 'হ্যাঁ!'

মালী বলল, 'আসুন না বাবু। আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। অনেকদিন এখানে তেমন কারো পায়ের ধুলো পড়ে না। এ বাগানে ফুল ফুটবে কি করে বাবু? এ বাড়ির শ্রী ফিরবে কী করে?'

শঙ্কর বলল, 'ঠিক বলেছ। আমি তাহলে তাকে নিয়ে দু' একদিনের মধ্যেই আসব। তুমি সব ঠিকঠাক গোছগাছ করে রাখবে তো?'

মালী বলল, 'নিশ্চয়ই রাখব বাবু। দেখবেন আপনাদের কোন অসুবিধে হবে না। আমি সব সাজিয়ে রেখে দেব।'

শঙ্কর বলল, 'তাই রেখো।'

তারপর কি ভেবে ঘড়িপকেটের ভিতরে থেকে তার শেষসম্বল পাঁচ টাকার নোটখানা মালীর সামনে তুলে ধরে বলল, 'নাও।'

মালী জিভ কেটে বলল, 'সে কি বাবু, আমি তো আপনার জন্যে এখনো কিছুই করিনি।'

শঙ্কর বলল, 'আহা করবে তো। হয় কাল, না হয় পরশু। তুমি আগাম নিয়ে রাখো। তুমি আমার আপনজন। বিশ্বাসী মানুষ, নাও লজ্জা কোরো না।'

মালী টাকাটা নিয়ে প্রায় সাষ্টাঙ্গে শঙ্করকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল। তারপর হেসে বলল, 'চলুন বাবু, আজ তাহলে আপনাকে এগিয়ে দিই।'

হ্যারিকেন হাতে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে মালী বলল, 'খুব গোপন থাকে যেন কথাটা।'

শঙ্কর বলল, 'নিশ্চয়ই। তোমার কোন ভয় নেই।'

মালী বলল, 'আপনারও কোন ভাবনা নেই বাবু। আমি আপনাদের জন্যে সব ঠিক করে রাখব।'

শঙ্কর হেসে বলল, 'আচ্ছা আচ্ছা।'

তারপর গেট পার হয়ে রাস্তায় নেমে অন্ধকারের মধ্যে এগিয়ে চলল শঙ্কর।

পৃথিবীতে কেউ কোথাও তার জন্যে প্রতীক্ষা করে বসে নেই। কোনদিন হয়তো থাকবেও না। কি প্রেমে, কি অর্থে, কি শক্তিতে কোন নারীকেই সে হয়তো কোন দিন আকর্ষণ করতে পারবে না। কিন্তু এই বুড়ো মালী তার জন্যে নিশ্চয়ই অপেক্ষা করে থাকবে।

সে সারা বাড়ি পরিষ্কার করবে। একটি ঘরকে ধুয়ে মুছে সত্যিই বাসযোগ্য করে তুলবে। রাশি রাশি ফুল আনবে, মোমবাতি আনবে তারপর ফুলের মত সুন্দর মোমের মত নরম একটি মেয়ের মুখ দেখবে রাত্রির স্বপ্নে আর দিনের স্মৃতিতে।

বেশ হবে। শঙ্কর নিজের মনেই হাসল। এ যাত্রায় এই তার লাস্ট ব্লাফ।

সীমান্ত

আজ প্রথম নয়, গত দশ-বার বছর ধরে, গোবিন্দ আমার দাক্ষিণ্যপ্রার্থী। তখন আমি আর-একটি ছোট কাগজের অফিসে কাজ করতাম। গোবিন্দ সেই অফিসের বেয়ারা ছিল। তখন থেকেই ওর মাথার চুল আধপাকা, চেহারা জীর্ণ। জরায় নয়, অভাবে অনটনে দারিদ্র্যে দুশ্চিন্তায়। বেয়ারার কাজ করলে কী হবে, ওর পোষ্য অনেক, ছেলেমেয়ের সংখ্যা ছ'টি। স্ত্রী নিত্যরোগী। কিন্তু ছেলেমেয়ে হওয়া বন্ধ হবার লক্ষণ নেই। নাইট-ডিউটির সময় টেবিলের উপর বিছানা পাততে পাততে গোবিন্দ আমার কাছে প্রায়ই খেদ করত। আমি বলতাম, "তার জন্যে শুধু তোমার স্ত্রীকে দায়ী করা যায় না।"

গোবিন্দ লজ্জা পেয়ে চুপ করে থাকত। যতদূর জানি এত খোলাখুলি ভাবে সুখ-দুঃখের কথা বলবার মানুষ অফিসে গোবিন্দের আর কেউ ছিল না। কী করে আমাকে এত আপন ভাবতে পেরেছিল, সেই জানে। তখন থেকেই গোবিন্দ ধার চাইত। সিকি আধুলি থেকে দু টাকা পাঁচ টাকা পর্যন্ত। হয় বউ নাহয় ছেলেমেয়ে, কারও না কারও অসুখ-বিসুখ লেগেই আছে। হাত-টানাটানির আর শেষ নেই। ধারের দরকার হত গোবিন্দের। ধার বলেই নিত। শোধ দেওয়ার কথাও যে মাঝে-মাঝে না ভুলত তা নয়, কিন্তু দেওয়া আর হয়ে উঠত না।

মাসে আমার এক সপ্তাহ নাইট ডিউটি পড়ত, কিন্তু গোবিন্দের তখন সারা মাসই নাইট ডিউটি বাঁধা ছিল। দিনের বেলা কোন একটা হাইস্কুলে বেয়ারাগিরি করত। রাত্রে কাগজের অফিসে ডিউটি দিত। ফাইল-পত্র আনা, এটা-সেটা ফরমাস খাটা, প্রেসে কপি পাঠান, পান সিগারেট আনা—সবই করত গোবিন্দ, শুধু শেষ রাত্রে

বিছানা পাতার কাজটা প্রসন্ন মনে করতে চাইতনা। এই নিয়ে নাইট-শিফটের আরও তুজন বেয়ারার সঙ্গে ওর ঝগড়া প্রায় লেগেই থাকত।

কাজের খুঁত ধরলে, ভারী চটে উঠত গোবিন্দ, কখনও বা আক্ষেপের সুরে বলত, "কী করে পারব বাবু? এ-সব কাজ কি চোদ্দপুরুষেও কোনদিন করেছি যে আজ করব? তা ছাড়া এ কি পুরুষ মানুষের কাজ বাবু?"

বলতাম, "তা বটে। কিন্তু তুঃখ করে কী আর করবে গোবিন্দ। পৌরুষের পরিচয় দেওয়ার ক্ষেত্র পৃথিবীতে কজন পুরুষই বা পায়।"

আমার ঠাট্টা পুরোপুরি বুঝতে পারত না কি গায়ে মাখত না গোবিন্দ। নিজের মনেই বলে যেত, "জানেন আমিও কায়েতের ঘরের ছেলে। দেশে জমিজমা ছিল, মান-সম্মান ছিল। এককালে নবাবি আমিও কম করিনি। মশারিটাকে উটমুখো করে খাটিয়েছিল বলে পরিবারকে দমাদম লাথি মেরেছিলাম। আজ ভাগ্যের পালটা লাথি নিজের পিঠে পড়ছে বাবু!"

তারপর আমি অফিস বদলালাম। কিছুকাল পরে সেই দৈনিক কাগজ বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু গোবিন্দ আমার সঙ্গ ছাড়ল না। নতুন অফিসে একদিন এল দেখা করতে।

বললাম, "গোবিন্দ, তুমি আমার ঠিকানা পেলে কী করে!"

গোবিন্দ বলল, "বাবু, আমাদের আপনারা ভুলতে পারেন, কিন্তু আমরা ভুলি না। আমাদের সবই মনে থাকে। আপনি অনেক দয়া করেছেন। সাতজন্মেও তা শোধ দিতে পারব না। আর একটু দয়া করতে হবে।"

"বল কী করতে পারি।"

গোবিন্দ বলল, "পারেন বাবু ইচ্ছা করলেই পারেন। আপনাদের এই অফিসে একটা কাজকর্ম আমাকে ঠিক করে দিন। সেখানেও আপনার সেবা করেছি, এখানেও সেবা করব।"

গোবিন্দের বিনয় দেখে মুগ্ধ হলাম। কিন্তু দুঃখ জানিয়ে বললাম, "গোবিন্দ, এখানে আমাদের সেবকের অভাব নেই। কাজকর্ম যদি খালি হয়, তোমাকে খবর দেব।"

গোবিন্দ বলল, "কবে আর খবর দেবেন বাবু? মরে গেলে?"

বললাম, "কেন, স্কুলের চাকরিটা ত আছে।"

গোবিন্দ বলল, "তাতে আর কী হয় বাবু। একটা চাকরিতে আমার সংসারের আর কতটুকু আসান হয়। রাবণের গুষ্টী যে বাবু। যতগুলি পোষ্য, যতগুলি মুখ, ততগুলি চাকরি যদি করতে পারি, তবে সবাইর ক্ষিদে মেটে। মানুষ ত নয়, এক একটা রাক্ষস এসে জন্মেছে আমার ঘরে।"

কাজের তাড়া আছে। বেশীক্ষণ কথা বলা যায় না। বিদায়ের সময় একটা টাকা তুলে দিই ওর হাতে, এক কাপ চা খেয়ে যেতে বলি। গোবিন্দ সহজে উঠতে চায় না। বাধ্য হয়ে বলি, 'এবার তুমি এস।'

গোবিন্দ বলে, "আসব বই কি বাবু। আপনি বললেও আসব, না বললেও আসব। আমার কথাটা কিন্তু মনে রাখবেন।"

টেবিল থেকে মুখ না তুলে ঘাড় নেড়ে বলি, "হুঁ।"

শুধু অফিসেই নয়, বাড়িতে গিয়েও মাঝে মাঝে হানা দেয় গোবিন্দ। একই প্রার্থনা। চাকরি চাই। আমি তা দিতে পারি না। টাকাটা-আধুলিটাই দিই কি বড়জোর একবেলা খেতে বলি। আর মাঝে মাঝে শুনি ওর সংসারের গল্প। মেয়েরা বড় হয়ে উঠেছে। তাদের বিয়েথা দিতে হবে। গোবিন্দের মুখরা স্ত্রী নাকি তাকে প্রায়ই শাসায়, "সময়-মত বিয়ে যে দিচ্ছ না, রক্তমাংসের দেহ। যদি কিছু একটা অঘটন ঘটিয়ে বসে, তখন কী করবে।"

গোবিন্দ আমাকে সাক্ষী মেনে বলে, "কথা শুনুন বাবু। ও জাতের কোনদিন কোন আক্কেল-বুদ্ধি হবে না। খেতে দিতে পারি না, লজ্জা নিবারণের জন্য একখানা শাড়ি কিনে দিতে পারি না, আর আমি ওদের বর জুটিয়ে দেব। যেন ভাত-কাপড় জোগাড়

করার চেয়ে এ-বাজারে জামাই জোটান সহজ। আমাকে ভয় দেখান হয় যদি খারাপ কিছু ঘটে। আরে তা'হলে যে বেঁচে যাই। দু-একটার খারাপ হলে বাকী কটার তবু একটু ভাল হবার আশা থাকে। আমিও কিছু হালকা হই। একথা শুনে আমার পরিবার আরও আগুন হয়ে ওঠে। বলে, "তুমি মর, গলায় দড়ি দাও। বাপ হয়ে অকথা কুকথা বলছ, লজ্জা করে না তোমার?" লজ্জা করে কী করব বাবু। গরিবের কি আর লজ্জা সংকোচের কোন বালাই থাকে? ও সব বড়মানুষেরই সাজে। এই দেখুন আপনার কাছ থেকে এত নিই, একবারও হাত উপুড় করতে পারি না। লজ্জার মাথা খেয়ে তবু ত আসতে হয়।"

আমি বলি, "ও-সব কথা ছেড়ে দাও। ও নিয়ে তোমার ভাববার দরকার নেই।"

যতক্ষণ ও কথা বলে, আমার সাত বছরের ভাইপো দূর থেকে ওকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। চলে গেলে ওর সমালোচনা শুরু হয়। টুটুল বলে, "জ্যেঠামণি, লোকটা দেখতে কী বিশ্রী।"

আমি বলি, "তাই নাকি?"

টুটুল বলে, "জামাটা ছেঁড়া, জুতোটা তালি দেওয়া। আর কাপড়টায় কী গন্ধ জান জ্যেঠামণি?"

জানি। চেয়ার টেবিল, রেডিও-সেট, বইয়ের আলমারি, ফুলদানি দিয়ে সাজানো ঘরে গোবিন্দকে একেবারেই মানায় না। ঝকঝকে মেঝেয় ও যেখানে এসে দাঁড়ায়, মনে হয় সে-জায়গাটা সুদ্ধ নোংরা হয়ে গেল। ও একেবারে বেমানান। আমার ঘর দোরের সঙ্গে বেমানান, সভ্যতা সাহিত্য সংস্কৃতির সঙ্গে বেমানান। তবু ওরা আছে।

আছে কি? না, আমার কাছে ওদের অস্তিত্ব সব সময় নেই। থাকলে আমি সুস্থ হয়ে থাকতে পারতাম না। আমার জানলায় পর্দা, দরজায় পর্দা। সেই পুরু আর রঙীন পর্দার আড়ালে আমি বাস করি। আর লিখি। না, ওদের কথা লিখি না। কারণ ওদের

কথা আমি কিছু জানি না। শুধু কোন কোন সময় আমার দোরের সামনে ওদের দেখি। ভিখারীর বেশে, যাচকের বেশে মানুষের দারিদ্র্যদীর্ণ মূর্তি দুঃস্বপ্নের মত মাঝে মাঝে দেখে বিরক্ত হয়ে উঠি। এক মুঠি চাল কি দুটো-একটা পয়সা ফেলে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিই। কখনও বা তাও না দিয়ে বলি, "মাফ কর।"

গোবিন্দ চলে গেলে আমি কলম বন্ধ করে মাঝে মাঝে ভাবি। যদিও জানি, আমি ভেবে কিছুই করতে পারব না। যদিও ওরা দেশের পনের আনা, তবু ওদের কথা লিখবার সাধ্য পর্যন্ত আমার নেই। ওরা আমার চোখের আড়ালে. মনের আড়ালে, অনুভবের আড়ালে। তাই ওদের কথা আমি লিখিনে। ওদের আমি যতটুকু জানি, যৎসামান্য ওদের কথা আমি অনুভব করতে পারি, তা আমার লিখবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। কিন্তু এই যুক্তিই কি আমার পক্ষে যথেষ্ট?

গোবিন্দ সব সময় নিজের কথাই যে বলে, তা নয়, আমার সহানুভূতি আরও বেশি করে পাবার জন্যে আমার কথাও মাঝে মাঝে তোলে।

গোবিন্দ বলে, "বাবু, আপনার ত বড় কষ্ট।"

আমি অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাই, "আমার কষ্ট তুমি কিসে দেখলে।"

গোবিন্দ বলে, "অফিসেও কলম চালান, বাড়িতেও কলম চালান। কষ্ট হয় না আপনার? মাথার কাজ কি সোজা কাজ? গতর খাটানর চেয়েও মাথা খাটান শক্ত। দেখতে অতটুকু হলে কী হবে, কোদাল কুড়ুলের চেয়ে আপনাদের কলম কি কম ভারী বাবু?"

আমি অবাক হয়ে বলি, "তুমি সে-কথা কী করে বুঝলে গোবিন্দ?"

গোবিন্দ বলে, "বাবু, সবই বুঝি। একেবারে মুখ্যু তো নই। ইস্কুল টিস্কুলে পড়েছি। ছাত্র একেবারে খারাপ ছিলাম না বাবু।

কিন্তু নিজেরও ছুর্মতি হল আর মা-সরস্বতীও মুখ তুলে তাকালেন না, তাই অকালেই সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিলাম। নইলে এ-তুর্দশা হবে কেন? ভগবানের তুনিয়ায় এত কষ্ট ভোগ করবে কে? তার জন্যেও তো মানুষ চাই বাবু।"

কিন্তু কষ্টের আরও বাকী ছিল গোবিন্দের। একদিন ওর সেই স্কুলের বেয়ারাগিরিটিও গেল। ওর বয়স বেশি হয়ে গিয়েছে। শরীর অশক্ত। ওকে দিয়ে আর কাজ চলে না।

গোবিন্দ বলল, "বাবু এবার এক ফন্দি এঁটেছি।"

বললাম, "কী ফন্দি।"

গোবিন্দ বলল, "গুষ্টিসুদ্ধ সবাইকে এক ডিঙি-নৌকোয় তুলে মাঝ গঙ্গায় নিয়ে যাব। তারপর নৌকোর তলা দেব ফুটো করে।"

বললাম, "ছিঃ, অত হতাশ হয়ো না গোবিন্দ।"

গোবিন্দ কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলল, "না বাবু, আর সয় না। সেই ছেলেবেলা থেকে হাবুডুবু খাচ্ছি ত খাচ্ছিই। এর চেয়ে একেবারে ডুবে মরা ভাল।"

আমি ওকে আরও কিছু সত্নপদেশের সঙ্গে গোটা পাঁচেক টাকা দিলাম, সুপারিশ চিঠি লিখে ছু-চারজন বন্ধু-বান্ধবের কাছে পাঠালাম। কিন্তু ফল কিছু হল কি হল না বুঝে উঠতে পারলাম না। কারণ অনেকদিন গোবিন্দ আর দেখা-সাক্ষাৎ করল না।

মাস তিনেক বাদে ফের একদিন এল আমাদের অফিসে। বললাম "কী ব্যাপার? তোমার যে আর কোন খোঁজই নেই।"

গোবিন্দ বললে, "দেশে গিয়েছিলাম।"

বললাম, "দেশে মানে পাকিস্তানে? তোমার সেই কুমিল্লার গ্রামে।"

গোবিন্দ বলল, "হ্যাঁ বাবু। জলে দিতে আর মন সরল না। বনবাসে দিয়ে এলাম। সব রেখে এলাম সেখানে। ভিটেবাড়ি সব একেবারে জঙ্গলে ভরে গেছে বাবু। কিছু আর চেনা যায় না।"

বললাম, "তবু সেখানে সব রেখে এলে ?"

গোবিন্দ বলল, "উপায় কী বাবু? এখানে খেতে দেবে কী? পেটে যদি কাপড় বেঁধেও সব পড়ে থাকি, শহরে মাসে মাসে ঘরভাড়া গুনতে হয়। একটি পয়সা হাতে নেই, এত রকমের গুদাম ভাড়া কোত্থেকে জোগাই বলুন ত। তবু সেখানে শাকপাতা আছে, বড়ুই কলুই আছে, কুড়িয়ে খেতে পারবে। এখানে যে একগাছা ঘাসও বিনা পয়সায় মিলবার জো নেই বাবু।"

আমি বললাম, "তাহলে ভালই করেছ।"

তারপরেও গোবিন্দ মাঝে মাঝে আসে। একটানা দুঃখ-দারিদ্র্যের কথা ছাড়া তার মুখে আর কথা নেই। কাজকর্ম স্থায়ীভাবে এখনও কিছু ঠিক করতে পারেনি। যখন যা পায়, তা-ই করে। কী করে, আমি আর সে কথা জিজ্ঞাসা করি না। বেশি জানতে চাইলেই বিপদ।

ওর কাছেই শুনতে পাই, ছেলেমেয়েদের দেশে পাঠিয়েও শান্তি নেই গোবিন্দের। দু-পাঁচ টাকা যা রোজগার করে তা তাদের কাছে সময়মত পৌঁছে দেওয়া কঠিন। সরাসরি টাকা পাঠাবার ব্যবস্থা নেই, অনেক কার চুপি করেই পাঠাতে হয়। খিদিরপুরে একটি মুসলমান ছেলে আছে। জাহাজের খালাসী। গোবিন্দদের গাঁয়েই বাড়ি। সেই মবারেকের হাতে টাকা গুঁজে দিয়েও দুশ্চিন্তা যায় না। সে যে কখন তার বাপ বদন ব্যাপারীকে খবর পাঠাবে আর বদন খবর পেয়ে বাটা বাদ দিয়ে নিজের গাঁটের নগদ টাকা গোবিন্দের স্ত্রীর হাতে পৌঁছে দেবে, তার কিছু ঠিক নেই। তা ছাড়া, গোবিন্দ যা পাঠায়, তাতে তাদের মাসের অর্ধেকও যায় না। সেখানেও জিনিসপত্রের দাম আক্রা। ভাতের অভাব, কাপড়ের অভাব। গোবিন্দ বলে, "কপাল যাদের পোড়া, তাদের কোথাও গিয়েও সুখ নেই বাবু। তাদের এদেশ ওদেশ পূব-পশ্চিম সব সমান।"

শুনতে শুনতে আমার কান-সওয়া হয়ে গিয়েছে। কলম চালাই আর মাথা নাড়ি। নিতান্তই যখন বিরক্ত হই, পকেট থেকে সিকিটা আধুলিটা তুলে দিয়ে বলি, "এখন এস।"

এখন আর দান নেই। এখন আমি ঘুষ দিই। আমার মূল্যবান সময়কে ওর হাত থেকে বাঁচাবার জন্য এছাড়া আর পথ নেই।

গোবিন্দ যখনই আসে, আমাকে তার দুঃখ-দুর্ভাগ্যের কথা শুনিয়ে যায়। ওর পরিবারে কত অঘটন ঘটল। সাত আট বছরের একটি ছেলে নিউমোনিয়ায় ভুগে বিনা চিকিৎসায় মারা গেল। আঠের উনিশ বছরের একটি মেয়ে আত্মহত্যা করল। স্ত্রীও নাকি মাঝে-মাঝে সেই পথে যাবে বলে চিঠিতে শাসায়।

আমি সব শুনে যাই। কখনও 'হুঁ' বলি, কখনও 'হাঁ', কখনও বা বলি, 'আহাহা।'

ওকে দেখলে আমার কেন যেন একটা ভয় মেশানো বিরক্তিই আসে। জরায় আর দারিদ্র্যে ভারি বিশ্রী চেহারা হয়ে গিয়েছে ওর। কে যেন ওকে ভেঙে চুরে একেবারে মুচড়ে দিয়েছে। খোঁচা খোঁচা দাড়ি, লম্বা লম্বা চুল, ঠকঠক করতে করতে ক'খানা হাড় যখন আমার সামনে এসে দাঁড়ায়, আমি বড় অস্বস্তি বোধ করি।

মাঝে মাঝে আমি ভাবি, দুঃখকে অতিরঞ্জিত না করে গলার স্বরকে সব সময় অনুনাসিক না করে রেখে অন্তত দু-একটি সুখের রেখা গোবিন্দ ওর শুকনো মুখে ফুটিয়ে তুলতে পারে। স্ত্রীপুত্র-আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে জীবনের কোন-না কোন সময় কিছু সুখ তো ও পেয়েছে। সে সব কথা কি একবারও উল্লেখ করতে নেই? না কি আমার কাছ থেকে ছিটে ফোঁটা সহানুভূতি পাওয়ার জন্যে দুঃখের গন্ধমাদন ও বহন না করে পারে না। কোন সুখস্মৃতির অংশই আমাকে ও দিতে রাজী নয়। যেটুকু দিচ্ছি পাছে তা থেকেও আমি ওকে বঞ্চনা করি। আমার হীনতার সঙ্গে ওর দীনতার প্রতিযোগিতা। কখনও আমার জিত, কখনও ওর।

আবার মাস দুই আড়াই আমার চোখের আড়াল হয়ে রইল গোবিন্দ। দু-একবার ওর কথা আমার মনে পড়লেও আমি খবর নিতাম না। ভিখারীকে কে আর যেচে ভিক্ষা দিতে যায়। আসবার পালা ওর, আমার নয়।

যা ভেবেছিলাম, ও আবার এসে আমার সামনে দাঁড়াল। কিন্তু এবার আর ভালো করে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। খোঁড়া হয়ে এসেছে। হাতে একখানা লাঠি। ডান পাটা ভালো করে মাটিতে পড়ে না। বাঁকা হয়ে পড়ে।

বললাম, "কী ব্যাপার। পায়ে আবার কী হল তোমার।"

এতকাল বাদে গোবিন্দ হাসল। বলল, "গাড়িচাপা পড়েছিলাম বাবু।"

শিউরে উঠে বললাম, "সে কী।"

গোবিন্দ বলল, "হ্যাঁ বাবু। একটুর জন্যে শেষ হয়ে যাইনি। পাটাও যেতে যেতে রয়ে গেছে। জখম হয়েছে, তবে জহ্লাদ ডাক্তাররা যে একেবারে কেটেকুটে সব বাদ দেয়নি, তাই ভাগ্য বাবু। ভগবান বাঁচিয়ে দিয়েছেন।"

বললাম, "তা বটে। তারপর এখন আছ কোথায়? করছ কী?"

গোবিন্দ বলল, "তা কাজটা মন্দ জোটেনি বাবু। যাঁদের গাড়ি চাপা পড়েছিলাম, তাঁদের বাড়িতেই কাজ। খাওয়া-পরা তাঁরাই দেন। খুব ভদ্রলোক। দয়ালু। নইলে চাপা ত অনেকেই দেয়, কিন্তু তারপর অন্ন আর কজনে দেয় বাবু?"

আমি বললাম, "সত্যি কথা।"

গোবিন্দ বলল, "কাজও কোন খাটুনির কাজ নয়। বসে বসে কাজ। কর্তার দুটি বাচ্চা ছেলেমেয়েকে পাহারা দিতে হয়। কাজের তুলনায় মাইনে-পত্র ভালো।"

একটু হেসে বললাম, "ভালো হলেই ভালো।"

গোবিন্দ বলল, "কিন্তু বাবু বড় মুশকিলে পড়েছি।"

বললাম "আবার কী মুশকিল?"

গোবিন্দ বলল, "বসে বসে বাবু সময় আর কাটে না। ছেলেমেয়ে দুটো ত দুপুর হতে না হতেই ঘুমিয়ে পড়ে। আমি কী করি বলুন তো। দু-একটা বইটই হাতে পেলে সময়টা মন্দ কাটে না। কিন্তু ও-বাড়িতে সব ইংরেজী বই, খবরের কাগজ-খানা পর্যন্ত ইংরেজী। কী করি। তাই ভাবলাম আপনার কাছে যাই। আপনার ত বইয়ের অভাব নেই। নিজেই রাজ্যের বই লিখেছেন। তার একখানা দিন না আমাকে।"

আমি অবাক হয়ে খানিকক্ষণ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। এতকাল ও আমার কাছে রসদ চেয়েছে, আজ চায় রস। কিন্তু তাই বা ওকে আমি কতটুকু দিতে পারব ?

একটু বাদে বললাম, "আচ্ছা, তোমার জন্যে একখানা বই আমি কাল নিয়ে আসব।"

গোবিন্দ বলল, "আর কারো বই নয় বাবু। আপনার লেখা এক খানা বই-ই আমার চাই।"

মনে মনে হাসলাম। গোবিন্দ লেখকের মনস্তত্ত্ব জানে। মনিবই হোক আর দাসই হোক, যে কোন ব্যক্তির মধ্যে একজন সহৃদয় পাঠককে পেলে লেখক হাতে স্বর্গ পায়।

পরদিনই নিয়ে এলাম বই। নিজের বইতে গোবিন্দের নাম লিখে দিলাম।

হেসে বললাম, "তোমাকে দিলাম গোবিন্দ।"

গোবিন্দ বলল, "একেবারে ?"

"হ্যাঁ !"

গোবিন্দ অপ্রস্তুত হয়ে বলল, "ছি ছি বাবু, এ কী করলেন। আমি ত শুধু পড়তে চেয়েছিলাম।"

গোবিন্দ খুশী হয়ে চলে গেল।

দুদিন বাদে ফিরে এসে বলল, 'কী চমৎকারই লিখেছেন বাবু। এমন আর পড়িনি ?"

হেসে বললাম, "তোমার ভাল লাগল ?"

গোবিন্দ বলল, "খুব ভাল। আর একখানা বই চাই যে বাবু। না না আপনি অমন করে ধরে দেবেন না। শুধু পড়তে দেবেন। রোজ একখানা করে বই নিয়ে আসবেন। আমি একখানা দেব একখানা নেব।"

বললাম, "এ-অফিসে?"

গোবিন্দ বলল, "হ্যাঁ অফিসেই নিয়ে আসবেন বাবু। আপনার অফিসই কাছে, বাড়ি বড় দূর। এই খোঁড়া পা নিয়ে অত দূর যাওয়া বড় কষ্ট। আমি আপনার এই অফিসেই আসব। কাল ঠিক এই সময়ে। আর একখানা বই নিশ্চয়ই নিয়ে আসবেন।"

ওর সেই অন্তরঙ্গতায় হঠাৎ আমি দারুন অপমান বোধ করলাম। মুখ বিকৃত করে কঠিন স্বরে বললাম, "তুমি ভুল করেছ গোবিন্দ, আমি তোমার বেয়ারা নই।" রোজ তোমার জন্যে বই বয়ে আনতে আমি পারব না।"

গোবিন্দ বিমূঢ় হয়ে আমার দিকে মুহূর্তকাল তাকিয়ে রইল। তারপর কুঁজো দেহটাকে ধনুকের মত আরও বাঁকিয়ে দুহাত কপালে ঠেকিয়ে অস্ফূটস্বরে বলল, "মাফ করুন বাবু, আমার বড় অপরাধ হয়েছে।"

তারপর লাঠিখানা তুলে নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে গোবিন্দ অফিস থেকে বেরিয়ে গেল।

গোবিন্দ আর আসেনি।
